কালো ঘোড়া

সরোজ রায়-চৌধুরী

---

কবিবর মোহিতলাল মজুমদার

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

'কালো ঘোড়া' ১৩৫২ সালের পূজা-সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তকে কয়েকটি নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত করা হয়েছে।

শ্রীমন্তর বি-এ পরীক্ষার আর কয়েকমাস মাত্র বাকি। সে মাঝারি শ্রেণীর ছেলে। ভালোভাবে তাকে পাস করতে হ'লে প্রচুর পরিশ্রম করা প্রয়োজন। তাতে সে ত্রুটি করে না। ভগবান তাকে ক্ষুরধার বুদ্ধি দেননি। কিন্তু সে-ত্রুটি তিনি পুষিয়ে দিয়েছেন অটুট স্বাস্থ্য এবং অসামান্য পরিশ্রম করবার শক্তি দিয়ে।

শ্রীমন্ত পড়ছিলো।

রাত্রি তখন দুটোর কম নয়। ঘোষেদের অত বড় বাড়ি 'দেবধাম', একেবারে নিস্তব্ধ। বাইরের দোতলার বালাখানায় বারোটা পর্যন্ত হল্লা চলেছে। মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক অনেক কিছু। তাঁদের আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ফটকের রামমনোহর সিং ঘণ্টাখানেক আগেও সুর ক'রে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছিলো। সেও চুপ করেছে। কেবল দূরের বস্তিতে কারা হোলির গানের একঘেয়ে মহড়া দিচ্ছে। তারাই এখনো স্তিমিত হ'য়ে পড়েনি। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তাদের সুর এবং ঢোলের বাজনার শব্দ ভেসে আসছে।

যে ঘরটিতে শ্রীমন্ত থাকে, সেটাকে ঠিক বাইরের ঘর বলা যায় না। অন্দরও নয়। সদর এবং অন্দরের মাঝামাঝি একটি ছোট ঘর। তার একধারে একটা ছোট তক্তাপোশে তার বিছানা পাতা। ঘরটি জীর্ণ হ'লেও বিছানা বেশ ধোপ-দুরস্ত। ঝালর-দেওয়া নরম জোড়া-বালিশ, সুদৃশ্য বিছানার চাদর। বালিশ এবং চাদরের কোণে সুন্দর লতা-পাতার মধ্যে তার নামের আদ্যক্ষর 'S' লেখা।

তক্তাপোশের পাশে একটি ছোট্ট টিপয়। ওদিকে জানালার ধারে একটি ছোট টেবিল এবং চেয়ার। টেবিলের উপর শ্রীমন্তের পড়ার বইগুলো সাজানো রয়েছে। কলমদানিতে একটি মূল্যবান ফাউণ্টেন-পেন।

পা-তলার দিকে একটি র‍্যাকে তার কাপড়-জামাগুলোও গোছানো রয়েছে। সেগুলো মলিন নয়।

দেখলে বোঝা যায়, পরের বাড়িতে শ্রীমন্ত দুঃস্থ অনাদৃতভাবে নেই। বরং বেশ আরামেই রয়েছে। তার পোষাক-পরিচ্ছদ চাল-চলন এ বাড়ির নিকট-আত্মীয়ের মতো। যাকে 'চ্যারিটি বয়' বলে সে-রকমের নয়।

চেহারাও তার এই বাড়িরই নিকট-আত্মীয়ের মতো। টকটক করছে রং। দীর্ঘচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ, সুঠাম চেহারা। ঠোঁটে অল্প গোঁফের রেখা। মাথার কোঁকড়া চুল সযত্নে পিছন দিকে ব্রাশ করা। আজ-কালকার ফ্যাশান অনুযায়ী লম্বা জুলফি। ললাট, ভুরু ও নাক নিখুঁৎ। কেবল খুঁতের মধ্যে চোখ দুটি ছোট এবং ঠোঁট পুরু। কিন্তু সে-ত্রুটি চোখে পড়ে না। চাঁদে কলঙ্কের মতো তার মুখের সঙ্গে তা চমৎকার মানিয়ে গেছে।

নিজের রূপ সম্বন্ধে সে সকল সময় সচেতন। সে জেনেছে, সংসারে এই রূপের মূল্য আছে। সে সৌখিন ছেলে। সকল সময় দিব্য ফিট-ফাট থাকে। বিকেলে বেড়াতে বেরুবার সময় একটু স্নো-পাউডার মাখে, রুমালে এসেন্সও নেয়। আর, যা ব্যবহার করে সেগুলো সস্তা খেলো জিনিস নয়, ভালো-ভালো দামী জিনিসই।

সন্ধ্যা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত শ্রীমন্ত একনাগাড়ে ঠায় চেয়ারে ব'সে পড়েছে। তার মেরুদণ্ড টন টন করছিল। ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছিলো।

কিন্তু ঘুমোনো কিছুতেই চলবে না।

বড়লোকের ছেলেদের ফেল করা পোষায়। কিন্তু তার নয়। তাকে পাস করতেই হবে এবং এইবারে, এই প্রথমবারেই। রাত্রি তিনটে অবধি সে পড়বে। তারপর ঘড়িতে ছ'টার এলার্ম দিয়ে সে শোবে। এলার্ম বাজামাত্রই সে উঠে, মুখহাত ধুয়ে আবার পড়তে বসবে,—বেলা এগারোটা পর্যন্ত। একবারে যাদের পাস করতে হবে, তিন ঘণ্টা ঘুমই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

তবু ঘুমে চোখ বুঁজে আসে।

শ্রীমন্ত ঘড়ি দেখলে একটা বেজে গেছে। ষ্টোভ জ্বেলে নিজেই একটু কফি তৈরী করে খেলে।

হ্যাঁ। ঘুম এবার কেটে যাচ্ছে। চেয়ারে পা ঝুলিয়ে ব'সে থেকে শীতে পা'টা যেন জমে গিয়েছিল। কফি খেয়ে শরীরটা একটু গরমও হ'ল। কফির গুণ আছে। কিন্তু মেরুদণ্ডের বেদনা কফিতে সারে না। আর চেয়ারে ব'সে নয়, বাকি সময়টা বিছানায় লেপ-মুড়ি দিয়ে পড়া করাই ভালো।

সেই নভেম্বর থেকে এই পড়ার চাপ আরম্ভ হয়েছে। তার যে অসুরের মত স্বাস্থ্য, তাও যেন ভেঙ্গে আসছে। নার্ভটা ঠিক রাখতে হবে। 'ডিক্সোভাইন'টা আরও কিছুদিন ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ শিশিটা ফুরিয়ে আসছে। কাল আর এক শিশি কিনতে হবে।

টাকাও কিছু দরকার। ব্যাগে আর বিশেষ কিছু নেই।

শ্রীমন্ত টেবিল-ল্যাম্পটা বিছানার মাথার দিকে টিপয়ের উপর রাখলে। রূপোর ডিবেয় সুগন্ধী পান তৈরী করাই ছিল। গোটা দুই পান মুখে পুরে একটা সিগারেট ধরালে।

সিগারেটটি শেষ ক'রে 'অ্যাশ্‌ট্রে'র মধ্যে ফেলে দিয়ে চিৎ হ'য়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া করতে লাগলো।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হ'ল, ঠুক ঠুক।

তারপরে আবার ঠুক ঠুক ঠুক।

খুব আস্তে আস্তে শব্দ। শ্রীমন্ত লেপটা সরিয়ে দিয়ে উঠে এসে সন্তর্পণে দরজা খুলে দিলে।

হৈমন্তী!

তাড়াতাড়ি ওর পাশ কাটিয়ে হৈমন্তী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। শ্রীমন্ত দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

বিরক্তভাবে হৈমন্তী বললে, দরজাটা বন্ধ ক'রে রেখেছিলে তো? আমি যাতে না আসি সেই তোমার ইচ্ছে, না? আমি যাই বেহায়া, তাই আসি।

রাগে, দুঃখে ওর চোখ ছল ছল করে উঠলো।

শ্রীমন্ত ব্যস্তভাবে ওকে আদর ক'রে নিয়ে এসে বিছানায় বসালে।

আজকে পড়ার দায়ে নিশ্চিন্তি! মনে-মনে তার রাগই হচ্ছিল।

কিন্তু অভিনয়ে সে দক্ষ। মুখখানি সে করুণ করে বলল, ছিঃ! ছিঃ! এমন কথা তুমি ভাবলে হিমু? অবশ্য আমি ভেবেছিলাম, আজ আর হয়তো তুমি আসবে না। কিন্তু দরজা সেজন্যে বন্ধ করিনি। ও-দরজাটা এমনি বেয়াড়া যে একটু হাওয়াতেই খুলে যায়। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে লাগে।

হৈমন্তীর মন একটুখানি প্রসন্ন হ'ল।

বললে, বাইরে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও ভয় লাগে। কি জানি, কখন কে দেখে ফেলে। সে-কথা বোঝ না কেন ?

শ্রীমন্ত তেমনি কুণ্ঠিতভাবে বললে, বুঝি। কিন্তু ওই যে বললাম, ভেবে'ছিলাম আজ আর তোমার দয়া হবে না।

হৈমন্তী এবারে ফিক করে হেসে ফেললে। বললে, তোমার পরীক্ষা। আসব না-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু এগারোটা, বারোটা, একটা বাজলো, ঘুম আর কিছুতে আসে না। শেষে দুটো যখন বাজলো আর পারলাম না থাকতে। চুপি-চুপি বাইরে বেরিয়ে এলাম। বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখি, তোমার জানালার খড়খড়ি দিয়ে আলো আসছে। ঘরের মধ্যে দিদি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।

—দিদি জানতে পারবেন না তো ?

একটা রহস্যময় হাসি হেসে হৈমন্তী বললে, কি জানি !

—তোমার ভয় করছে না ?

হৈমন্তীর মুখ হঠাৎ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠলো। বললে, না। তোমার জন্যে আরও অনেক শক্ত কাজ আমি করতে পারি। হয়তো করতে হবেও ! সেদিন দেখো।

হৈমন্তী অন্যদিকে চেয়ে স্তব্ধভাবে বসে রইলো।

শ্রীমন্ত খুশি হয়ে উঠলো। তার মস্তিষ্কে তখন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোল খাচ্ছে একটি কথা : ব্যাগ খালি হয়ে এসেছে ; কিছু টাকার দরকার।

খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে ছিল হৈমন্তী। শ্রীমন্তর জন্যে অনেক শক্ত কাজ হয়তো একদিন তাকে করতে হবে,—এই কথার সম্পূর্ণ অর্থ শুধু সেই জানে। শ্রীমন্ত জানে না, জানার আগ্রহও তার নেই। তার

ব্যাগ খালি হয়েছে। কিছু টাকার বড় দরকার। সে হৈমন্তীর পায়ের তলায় মেঝের উপর বসলো। তার মুখের নিচের অর্ধেকটায় টেবিল-ল্যাম্পের অনাবৃত আলো এসে পড়েছে। উপরার্ধে নীল-সোনালি ঝালরের ফাঁক দিয়ে নীল-সোনালি আলো।

নিজের সুন্দর মুখের মূল্য সে বোঝে।

সেই বিচিত্র আলোয় সুন্দর মুখখানি হৈমন্তীর মুখের দিকে তুলে সে আগ্রহভরে বললে, সে আমি জানি হিমু। কিন্তু তবু তুমি যখন রাগো, তখন আমার ভয় করে। নিজেকে এত অসহায় বোধ হয় যে চারিদিকে অন্ধকার দেখি।

হৈমন্তীর স্তব্ধতা তখনও কাটেনি। গুরুতর কিছু-একটা হয়তো ঘটেছে। কিন্তু সেটা এখনও শ্রীমন্তকে বলার সময় হয়নি। একা তার মনকেই ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে। হয়তো এখনও কিছুদিন একা তাকেই সেই ভার বইতে হবে।

শ্রীমন্তের কথায় সে নিঃশব্দে তার মাথার কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

হৈমন্তী যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

তখন পাঁচটা বেজে গেছে। কিন্তু শীতের রাত্রি, বেশ অন্ধকার রয়েছে। অন্দর সুখসুপ্ত। সদরে রামমনোহরের ঘটি মাজার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। রাজপথে ট্রাম তখনও চলছে না। কিন্তু মাঝে মাঝে রিক্সার ঠুং ঠুং শব্দ ভেসে আসছে।

যাবার আগে হৈমন্তী বাইরের দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে সেইখানে ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু দাঁড়ালো।

কী চমৎকার কুয়াশা করেছে বাইরে!

শ্রীমন্ত ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই হাওয়া ফুসফুস ভর্তি ক'রে গ্রহণ করতে লাগলো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হৈমন্তীর উত্তপ্ত মুখ যেন জুড়িয়ে গেল। আঃ!

একটু পরে শ্রীমন্ত বললে, আর নয় হিমু। আর দেরি করা ঠিক নয়।

হৈমন্তী রেগে বললে, তাড়িয়ে দিচ্ছ!

—ছিঃ! ছিঃ! ওকথা বোলো না। আমার বড় ভয় করে। দিদির ঘুম ভেঙ্গে গেলে সর্বনাশ হবে।

ফিক করে হেসে হৈমন্তী বললে, সর্বনাশের কি কিছু বাকি আছে? দিদি ছ'দিন হ'ল এসেছেন, তুমি কি মনে কর, এর মধ্যে সে কিছুই টের পায়নি?

ভয়ে শ্রীমন্তের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

বললে, বলো কি!

অন্ধকারে ওর মুখ হৈমন্তী দেখতে পেলে না। কিন্তু কণ্ঠস্বরে ওর ভয়ার্ত অবস্থা টের পেলে।

বললে, আমি ঠিক জানি না। এখনও টের না পেলেও টের শিগগির পাবেই। তাতে তোমার ভয়টা কি?

শ্রীমন্তর সমস্ত দেহ শিউরে উঠলো।

বললে, ছেলেমি কোরো না হিমু। তুমি তো জানো না, কিন্তু আমি নিজে জানি, এইভাবে কত খুনখারাপি হয়ে গেছে।

হৈমন্তী দৃঢ়ভাবে বললে, আমি বেঁচে থাকতে নয়।

ওর সাহস দেখে শ্রীমন্ত মুহূর্তকালের জন্যে হতবাক হয়ে গেল। কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ের বুকে এত সাহস? বোধ করি, জানে না ব'লেই।

ব্যাকুলভাবে শ্রীমন্ত বললে, অমন কাজও কোরো না লক্ষ্মীটি। দিদি যে ক'দিন আছেন, সে ক'দিন অন্ততঃ সাবধানে থেকো। নইলে তুমিও যাবে, আমিও যাব।

হৈমন্তী ওর ব্যাকুলতা দেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত ওর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি হাসছ হিমু, কিন্তু ভয়ে আমার সর্বশরীর হিম হয়ে গিয়েছে। তুমি কথা দাও, তুমি সাবধানে থাকবে?

এক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হৈমন্তী বললে, আচ্ছা, দিলাম কথা। দিদি আরও হপ্তাখানেক থাকবে। এর মধ্যে এ-ঘর আর মাড়াবো না।

বলতে-বলতে হৈমন্তীর চোখ ফেটে জল এল। কিন্তু তা শ্রীমন্তর চোখে পড়লো না।

সে খুশি হয়ে বললে, কেবল কাল একবার আসতে হবে। রাত্রে নয়; দিনে। আমি যখন থাকবো না সেই সময়, একনমিক্সখানার ভিতরে দু'খানা দশ টাকার নোট রেখে যাবে, কেমন?

হৈমন্তী তখনও নিজেকে সামলাতে পারেনি। কোনোমতে বললে, আচ্ছা।

তারপর চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনীর আমলের কথা।

হরেরাম ঘোষ সেই আমলে একটি ইংরেজ ব্যবসায়ী ফার্মের মুৎসুদ্দি ছিলেন। তিনি নামে রাজা হননি বটে, কিন্তু মুৎসুদ্দিগিরি থেকে যে অর্থ তিনি ক'রেছিলেন তা রাজারই ঐশ্বর্য। ওদিকের চমৎকার ঠাকুর-বাড়ী, নাটমন্দির, রাধাবিনোদের নিত্যভোগ, অতিথিশালা এবং এদিকের নহবৎখানা, চাকর-দরওয়ানের থাকবার ঘর, বালাখানা, ভিতরের বিরাট অন্দরমহল,—এর অধিকাংশই তাঁর তৈরী।

অনেককাল তিনি গত হয়েছেন, কিন্তু বালাখানায় ইংরেজ শিল্পীর হাতে আঁকা তৈলচিত্র দেখলে তাঁকে অনেকটা বোঝা যায়: মাথায় ছোট-ছোট ক'রে ছাঁটা চুলে পরিপুষ্ট টিকি, কণ্ঠে মোটা-মোটা তুলসী কাঠের মালা, ললাটে, নাসিকায়, অনাবৃত, লোমশ বক্ষে, বাহুতে তিলক, হাতে হরিনামের ঝুলি,—ঘোষ মশাই ভগবানের নাম করছেন। প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু এবং গরুড়ের মতো বক্রাগ্র নাসিকা দেখলে বোঝা যায় তাঁর তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির অভাব ছিল না। বৈষ্ণবী বিনয় বিষয়বুদ্ধি অর্জনে সাহায্যই করেছে।

তাঁর পুত্র রামরাম অনেকটা পিতার মতোই বৈষ্ণব। তবে পিতার চেয়ে সুপুরুষ এবং অর্থের ঔদ্ধত্য চোখের কোণে ঈষৎ প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর যে তৈলচিত্র বালাখানায় টাঙানো আছে তাও ভক্ত বৈষ্ণবেরই ছবি। কিন্তু পিতার মতো অনাবৃত গাত্রে নয়, গায়ে হালকা জরির কাজ-করা একখানা মিহি চাদর আছে।

বলতে গেলে, এই বংশের আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় রায়

বাহাদুর প্রতাপচন্দ্র ঘোষের তৈলচিত্র থেকে। তিনি মুৎসুদ্দিগিরি করতেন না। পিতৃ-ত্যক্ত বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি থেকে রাজার মতো বিলাসে দিনযাপন করতেন। ছবিতেও এই পার্থক্য দেখা যায়। প্রতাপচন্দ্রের ছবি বিনীত বৈষ্ণবের নয়, সেকালের অভিজাত ভদ্র-লোকের। মাথায় কার্ণিসওয়ালা পাগড়ী, পরিধানে মূল্যবান চোগা-চাপকান, বক্ষে গণিত চিহ্নের মতো পাকদেওয়া চাদর।

হরেরাম এবং রামরাম ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠতেন। প্রাতঃকৃত্য এবং পূজা সেরে বাইরের বালাখানায় এসে বসতেন। গঙ্গাস্নান-প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ফেরার পথে পায়ের ধূলো দিয়ে যেতেন। সেই রজ তাঁরা মূল্যবান রেশমী রুমালে ক'রে নিয়ে একটি রূপার কৌটায় সংগ্রহ ক'রে রাখতেন। পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক এবং প্রার্থীর সমাগম হ'ত। সাধ্যমত প্রার্থীদের কিছু-কিছু দিতেনও।

পাড়ার তিনকড়ি মুদী হঠাৎ মারা গেছে। নাবালক ছেলে অসহায়। শ্রাদ্ধের খরচ তাঁরাই দিতেন। নুটু দত্ত দুপুর রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ী ফিরে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করেছে। দরওয়ান দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসে সকলের সামনে কানে ধ'রে ওঠ-বস করিয়ে ছেড়ে দিলেন। সেই লোকটাই দুদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় এসে বাবুর কাছ থেকেই মদ খাবার জন্যে দুটো টাকা নিয়ে গেল।

পাড়ার লোকের রোগে-শোকে বিপদে-আপদে তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। প্রয়োজন হ'লে খালি গায়ে একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়েই তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হতেন। পাড়ায় কোনো ক্রিয়াকর্ম হ'লে তাঁর বালাখানা থেকেই তার ব্যবস্থা হ'ত। আবার তাঁর নিজের প্রয়োজনের সময়ও পাড়ার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই এসে প্রাণ দিয়ে খেটে সাহায্য করত।

তখন কলকাতা এতবড় সহর হয়নি।

পাড়াও ছিল ছোট। ধনীর প্রাসাদকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলি দালান এবং কতকগুলি গোলপাতার ঘর। গরুতে-মহিষে ধনীতে-দরিদ্রে একটি পল্লী. একটি ইউনিট।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চেনা। যেতে-আসতে দেখা হ'লে পরস্পর অভিবাদন-বিনিময় করে, কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সমাজের শ্রেণী বিভাগ তখনও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখনও বর্ণাশ্রমের পূর্ণ প্রতাপ। ব্রাহ্মণ তো বর্ণের গুরু। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। ক্রিয়াকর্মে স্বজাতির কাছেও জোড়হস্তে থাকতে হয়।

হরেরাম অথবা রামরাম কারও কাছেই ব্রাহ্মণ অথবা স্বজাতির কাছে জোড়হাত ক'রে থাকাটা ক্ষোভ অথবা লজ্জার বিষয় ছিল না। তখন সেইটেই ছিল সামাজিক ভদ্রতা। তার ব্যতিক্রমই ছিল লজ্জার বিষয়।

সামাজিক ছাড়া অন্য ক্রিয়াকর্মও অবশ্য ছিল। তার চাল কিন্তু আলাদা।

সন্ধ্যার পরে উপরের বালাখানায় কার্পেট বিছানো হ'ল। ঝাড়ের আলো ঝলমল করতে লাগলো।

বাইজির নাচ হবে।

তাতে নিমন্ত্রিতের দল কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশী নয়। সহরের গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোক, হরেরাম-রামরামের সমপদস্থ ব্যক্তি, সাহেব-সুবো। আতর-গোলাপ-পানের ছড়াছড়ি। মদ্য এবং গড়গড়ায় সুগন্ধী তাম্রকুটের আয়োজনও আছে।

এ মজলিস বর্ণাশ্রমী নয়। অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা এরই সাহায্যে বর্ণাশ্রমকে ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত করার চেষ্টা করছিল, অথচ কেউ তা টের পাচ্ছিল না। এখানে দরিদ্রের স্থান ছিল না। ইংরেজ শাসক

ও ব্যবসায়ীকে কেন্দ্র করে নতুন অভিজাত সমাজ-ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠছিল প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে।

হরেরাম-রামরামের দল টিকি রাখতেন, সন্ধ্যাহ্নিক করতেন। পূজা-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসবও ভক্তির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'ত। আবার মজলিসে গিয়েও বসতেন। সাহেব-সুবোদের সঙ্গে পান-তামাকও চলতো। একসঙ্গে বিলিতি মদ্যপানেও আপত্তি করতেন না।

কিন্তু সমাজের সম্বন্ধে তখনও তাঁরা বেপরোয়া হননি। সমাজ-ব্যবস্থার উপর শ্রদ্ধাও একটা ছিল। তাই অনাচার যা করতেন তা গোপনেই করতেন, ভয়ে ভয়ে। এবং প্রকাশ্যে বর্ণাশ্রমী সমাজের নিয়ম-কানুন যথাসাধ্য মেনে চলতেই চেষ্টা করতেন। ব্রাহ্মণ-সজ্জন, ইতর ভদ্র ভালো-মন্দ নিয়ে দোষে-গুণে যে সমাজ, তার সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন।

এমন কি, তাঁরা যা গোপনে করতেন, প্রকাশ্যে তাই যারা করতো তাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না। অর্থাৎ অনাচারের উপর রাগ তাঁদের প্রবল ছিল না, কিন্তু সমাজের উপর অনুরাগ ছিল প্রবল। তাই প্রকাশ্যভাবে সমাজকে উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য কেউ প্রদর্শন করলে তাকে তাঁরা কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে চাইতেন না। আমাদের সমাজে শাস্তিদানের যতগুলি ব্যবস্থা আছে একে একে সেইগুলো তাদের উপর প্রয়োগ করা হ'ত। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের তাঁরা বশংবদ সহযোগী ছিলেন।

কিন্তু কলকাতা সহর অত্যন্ত দ্রুতবেগে বাড়তে লাগলো।

ইংরেজের শাসন যত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো, বাংলার বাইরের

অন্যান্য প্রদেশেরও সহর এবং গ্রামাঞ্চল থেকে তত লোক এসে ক'লকাতায় জমতে লাগলো। কেউ চাকুরীর চেষ্টায়, কেউ ব্যবসার জন্যে।

পাড়ায়-পাড়ায় ঝোপ-জঙ্গল খানা-ডোবা ভর্তি হয়ে সেখানে ছোট-বড় নানারকম বাড়ী উঠতে লাগলো। রাত্রে শেয়ালের ডাক ধীরে ধীরে দূরে স'রে যেতে লাগলো। যে সব রাস্তার দুইদিক জঙ্গলে আবৃত ছিল, লোকে সন্ধ্যার পরে যে সব রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভয় পেত, তার দু'ধারে বাড়ী তৈরী হতে লাগলো। নানাদিকে নতুন-নতুন রাস্তা তৈরীও আরম্ভ হয়ে গেল।

নানা দিক থেকেই অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন দেখা যেতে লাগলো।

আগে অভিজাতদের এবং সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ রমণীদের একমাত্র যান ছিল পালকী। দেখতে-দেখতে ক'লকাতার রাজপথে নতুন দেশী ও বিলাতী প্যাটার্ণের ঘোড়ার গাড়ী যেতে লাগলো। বাতি ও প্রদীপের জায়গায় এল কেরোসিনের আলো।

এতদিন রেড়ীর তেলের আলোয় যারা অভ্যস্ত ছিল, কেরোসিনের জ্যোতিতে তাদের বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। ইংরিজি সভ্যতার হাওয়া চারিদিক থেকেই তাদের চমক লাগিয়ে দিলে।

ঘোষেদের 'দেবধামে'ও হাওয়া বদলাতে লাগলো।

হরেরাম গত হলেন। সদরে এবং অন্দরে রামরাম পিতার পুরোনো ব্যবস্থাই যথাসম্ভব অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করলেন। সদরে সকালে সন্ধ্যায় পাড়ার ব্রাহ্মণ-সজ্জন এবং প্রতিবেশীরা আসেন। প্রার্থীরা কিছু কিছু পায়। যে সব দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং অনাত্মীয়দের হরেরাম

অর্থসাহায্য করতেন, রামরাম তাঁদের পূর্ববৎই সাহায্য পাঠাতে লাগলেন। কাশীতে যে সব দুঃস্থ বিধবাদের জন্যে টাকা যেত তাও যেতে লাগলো।

সদরে বিশেষ পরিবর্তন বোঝা গেল না। কিন্তু অন্দরে?

অন্দরেও বাইরে থেকে কিছুই পরিবর্তন বোঝা যায় না। কিন্তু ভিতরে ভাঙন ধরেছে।

প্রতাপচন্দ্র তখন হিন্দু কালেজের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। সেকালে হিন্দু কালেজে পড়ার গৌরবই আলাদা। তার পড়ার ঘর, লাইব্রেরী এবং ড্রইং রুমের মূল্যবান বিলাতী সজ্জা একটা দেখবার জিনিস।

বাড়ীর এই অংশটা সদর এবং অন্দরের মাঝামাঝি জায়গা। রামরাম ভিতরে-ভিতরে পুত্রের ইংরিজি চাল-চলন সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করতেন, এবং পুত্রের অনুপস্থিতিতে মাঝে-মাঝে প্রতিবেশীদের নিয়ে গিয়ে ছেলের ঘরগুলো দেখাতেন।

সকালে-বিকালে প্রতাপের বন্ধুরা মাঝে মাঝে পালকীতে এ-বাড়ী আসতো। সেও একটা দেখবার জিনিস।

এমনি ক'রে বিলিতি চাল-চলন প্রতাপের ঘরে এবং সেখান থেকে, রামরামের অজ্ঞাতসারে, মেয়েদের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছিল।

যাঁরা বলেন, আমাদের দেশের মেয়েরা স্বভাবতঃ রক্ষণশীলা তাঁরা, শুধু আমাদের দেশেরই নয়, কোনো দেশের মেয়েকেই জানেন না। মেয়েরা যত সহজে এবং বিনায়াসে পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে পারে এমন পুরুষেও পারে না।

বলতে গেলে রামরামের গৃহিণী ছাড়া আর সকলেই রামরামকে লুকিয়ে হাত-ওলা বডিস ও হাত-কাটা শেমিজ ব্যবহার করতে লাগলো এবং মাথায় চুলে 'এলবার্ট'ও কাটতে লাগলো।

রামরামকে লুকোনো কিছুই কঠিন ছিল না। সেকালে পুরুষেরা

অন্দরে যেত অল্পই। দুপুরে আহার ও নিদ্রার জন্যে ঘণ্টাকয়েক এবং রাত্রে বারোটা-একটার পর তাঁরা অন্দরে যেতেন। দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় তাঁরা বাইরেই কাটাতেন। সুতরাং অন্দরে যা-খুশি করবার অবাধ সুবিধা মেয়েদের ছিল।

রামরাম জীবিত কালেই দেখে গেলেন, তাঁদের বাড়ী এবং পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে যে পল্লীটি গড়ে উঠেছিল, প্রতাপচন্দ্র তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

পল্লী বেড়ে গেছে।

এসেছে সেখানে অনেক অপরিচিত লোক। তাদের সংখ্যা অনেক। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। তাদের সঙ্গে সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে সময় লাগে। কিন্তু মানুষের হাতে সময় কম হয়ে আসছে।

প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে ওদের আচারে-আচরণেও যথেষ্ট পার্থক্য এসেছে। ওরা যেন এক সমাজের লোকই নয়। প্রতাপের ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজবিহারী মন আর ওদের সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছে না। প্রাচীন সমাজব্যবস্থার উপর সে-শ্রদ্ধাও তার নেই, সে-ভয়ও নেই। মস্ত বড় বাড়ী, অপরিমিত অর্থ এবং জুড়ি-ব্রুহাম নিয়ে প্রতাপ স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন। বাড়ীতে পাড়ার ইতর-ভদ্র, অর্থী-প্রত্যর্থীর আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধ হয়ে গেল শুধু সদরেই নয় অন্দরেও।

'দেবধামের' অন্দরের তেতলার জানালাগুলো খুললেই পাড়ার অনেকগুলি বাড়ী দেখা যায়। রামরামের গৃহিণী যতদিন বেঁচে ছিলেন, সেই দিক দিয়ে পাড়ার গৃহিণী ও বধূদের সঙ্গে তিনি সংযোগ রেখে ছিলেন। দুপুরে প্রতিবেশিনীরা ছাদে এলে তিনি জানালা দিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প

করতেন। কার কি দিয়ে রান্না হ'ল, কার ক'টি ছেলেমেয়ে, কার মেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে কি কষ্ট পায়,—সব খবর তিনি রাখতেন। নিজের বাড়ীর সুখ-দুঃখের কথাও অসঙ্কোচে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। কারও মেয়ে শ্বশুর বাড়ী থেকে ছেলে হ'তে এলে তার সাধ পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর নিজের অন্তঃস্বত্বা মেয়ের জন্যে কেউ সামান্য কুলের আচার পাঠালে হাসিমুখে হাত পেতে নিতেন। বিপদে-আপদে দু'পয়সা দিয়ে লোককে সাহায্যও করতেন এবং তার জন্যে গর্ব বোধ করতেন না।

মানুষের মধ্যে ছোট-বড়র বিচার তিনি করতেন জাত নিয়ে।

দরিদ্র ভট্টাচার্য গৃহিণী মোটা গড়া প'রে এবং ফাটা-পা নিয়ে তাঁর বাড়ী এলে তিনি ভক্তি সহকারে তাঁকে প্রণাম করতেন। দত্ত-গৃহিণীকেও দরিদ্র বলে ঘৃণা করতেন না। বাড়ী এলে সমাদরে নিজের পাশে বসাতেন। কত সুখ-দুঃখের গল্প করতেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে পাট উঠে গেল। জানালায়-জানালায় পর্দা পড়লো।

পুরানো অভ্যাসবশে প্রতিবেশিনীরা ছাদে এসে জানালার দিকে চাইলেই এ-বাড়ীর মেয়েরা দ্রুতবেগে পর্দা টেনে দিয়ে স'রে যেতে লাগিলেন।

প্রতিবেশীর সঙ্গে মনের কথার আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল।

ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের এই যে ব্যবধান ইউরোপীয় সভ্যতার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হ'ল, তা আজও পর্যন্ত রয়ে গেছে বরং আরও প্রসারিত হয়েছে।

কিন্তু এই ব্যবধানও সম্পূর্ণরূপে অর্থগত ছিল না। অনেকখানি সংস্কৃতিগত।

তখন হিন্দু কালেজ থেকে যাঁরা বেরিয়ে আসতেন, আচারে, ব্যবহারে,

চিন্তাধারায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁদের সঙ্গে পুরাতন সমাজের শুধু যে মিল ছিল না তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা প্রাচীন সমাজের বিরোধী ছিলেন।

প্রতাপের বালাখানার পুরাতনপন্থী সজ্জা বদলে গেল। সেই সঙ্গে সেখানকার পুরানো মজলিসের রূপও। তাদের আলাপ আলোচনা এ-পাড়ার লোকদের দুর্বোধ্য।

সুতরাং ব্যবধান একতরফা ছিল না। উভয়পক্ষই স্বেচ্ছায় পরস্পরের থেকে স'রে এসেছিল।

[ ৩ ]

কিন্তু বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধনীর বালাখানাতে এসেই থেমে গেল না। ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেও তা প্রবেশ করতে লাগলো।

বিদেশী বণিকের মুৎসুদ্দির প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের এবং গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন পড়লো বিশেষ ক'রে কেরাণীর।

সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হ'তে লাগলো।

যা ছিল মুষ্টিমেয় একটা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, মফঃস্বলের সহরে-সহরে, এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামে পর্যন্ত। ইংরেজি শিক্ষা যারা পায়, তারা দলে-দলে চ'লে আসে ক'লকাতায় কেরাণীগিরির প্রত্যাশায়। তখন কেরাণীগিরি দুর্লভ ছিল না।

কলকাতা সহর দিন-দিন বেড়ে চলে।

প্রতাপচন্দ্রের পরে তাঁর দুই ছেলে সম্পত্তির মালিক হ'লেন, স্নেহাংশু আর শুভ্রাংশু।

স্নেহাংশু পড়াশুনোয় বেশি দূর এগুলেন না। গোটা পাঁচ-ছয় স্কুল ঘুরে তিনি একদিন বাড়ীতে এসে বসলেন। চেষ্টা নিষ্ফল বুঝে প্রতাপচন্দ্রও তাঁর উপর আর চাপ দিলেন না। তৎপরিবর্তে বিবাহ দিয়ে স্নেহাংশুকে সম্পত্তি দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত করলেন।

ছোট শুভ্রাংশু পড়াশুনায় ভালো। এখানকার পরীক্ষাগুলো কৃতিত্বের সঙ্গে পাস ক'রে তিনি চ'লে গেলেন বিলেত,—আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্যে। আর ফিরলেন না।

কি যে তাঁর হ'ল, সে খবর নেবার জন্যেও কেউ রইলেন না। প্রতাপচন্দ্র মারা গেলেন। স্নেহাংশু তাঁর জন্যে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করার প্রয়োজন দেখলেন না। বেটা ছেলে, উদ্বেগের কি আছে? তিনি পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভায়ের কাছে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। এ ছাড়া আর করবার কি আছে?

বছরখানেক পরে প্যারিস থেকে এবং আরও বছরখানেক পরে মন্টিকার্লো থেকে দু'বার শুভ্রাংশু চিঠি দিয়েছিলেন। দু'খানাই তাঁর বাবার নামে। তা থেকে বোঝা যায়, পিতার মৃত্যুসংবাদ তিনি পাননি।

স্নেহাংশু এর উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কারণ দু'খানা চিঠিতেই টাকার তাগাদা ছিল।

উত্তর তো দিলেন না, চিঠির কথাটাই একেবারে চেপে গেলেন। মা তখনও বেঁচে। শুভ্রাংশু যে বেঁচে আছেন এবং টাকা চাইবার মতো বিপজ্জনকভাবে বেঁচে আছেন, সে কথাটা ভারতবর্ষের কেউ জানতেই পারলেন না।

অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্যে।

তার পরে জানা গেল। তখন স্নেহাংশুর মাও গত হয়েছেন। ভালোই হয়েছিল। কারণ, ছেলের মৃত্যুসংবাদ শোনার চেয়ে বড় আঘাত সে

বয়সে আর কী হতে পারতো? ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে যেতে হয়নি।

জানা গেল একটি মেমসাহেবের মুখে।

তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং শুভ্রাংশুর ধর্মপত্নী।

স্নেহাংশুকে তিনি তাঁদের বিবাহের এবং শুভ্রাংশুর মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেখালেন এবং আরও অনেক স্মৃতিচিহ্ন। যাতে ক'রে স্নেহাংশুর মতো কূট বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও মনে-মনে মেমসাহেবের উক্তির সত্যতা স্বীকার করতে হ'ল।

কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বললেন না।

মেমসাহেব আপনমনে ব'লে যেতে লাগলেন, কি ক'রে কলেজে পড়ার সময় শুভ্রাংশুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, কি ক'রে সেই বন্ধুত্ব বৎসরখানেকের মধ্যে প্রণয়ে পরিণত হয়। তারপরে উভয়ের বিবাহ।

বিবাহের কিছুদিন পরেই শুভ্রাংশু মদ্যপান আরম্ভ করলে। আই-সি-এস দিতেই পারলে না। বাড়ী থেকে কেন জানিনে তার টাকা আসাও বন্ধ হ'ল।

—আপনারা কি তাঁর কোনো চিঠিই পাননি?

স্নেহাংশু অম্লানবদনে 'না' বললেন।

—তা হবে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রচুর মদ্যপানের ফলে বুদ্ধির তাঁর স্থিরতা ছিল না। হয়তো নেশার মুখে ঠিকানা ভুল ক'রেছিলেন। কিংবা সে চিঠি হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি ডাকবাক্সে ফেলেনইনি।

একটু থেমে মেমসাহেব আবার বলতে লাগলেন:

—কিন্তু তবু আমি হাল ছাড়লাম না। নিজে একটা চাকরী নিয়ে ওঁর পড়ার খরচ যোগাতে লাগলাম,—ব্যারিষ্টারী পড়ার খরচ। আশা ছিল, ব্যারিষ্টারী পাস ক'রে এখানে এসে বসলেও চলে যাবে। কিন্তু মন দিয়ে পড়াশুনো করার শক্তিই ওঁর আর ছিল না। তার উপর অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে কঠিন অসুখ হ'ল। আমার পুঁজি বেশি ছিল না। তবু যা ছিল তাই দিয়েই ওঁর চিকিৎসার ত্রুটি করিনি। ওঁকে মণ্টিকার্লো চেঞ্জে পাঠালাম।

দশ বৎসর আগের কথা। সুতরাং পরের পর ঘটনাগুলো স্মরণ করবার জন্যে মেমসাহেব আবার একবার থামলেন। কিন্তু বিশেষ কথা বোধ করি মনে পড়লো না। সংক্ষেপে শেষ করার জন্যে বললেন :

—এর পরে তিন বৎসর ইউরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে উনি স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। আমি তখন প্রচুর ঋণগ্রস্ত। শেষ পর্যন্ত আমার একটি আত্মীয়কে ধ'রে ইণ্ডিয়া অফিসে ওঁর জন্যে একটা চাকরীও যোগাড় করলাম। ধীরে ধীরে দেনা শোধ হচ্ছিল। আমরা একটু শান্তির মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। এমন সময়…

মেমসাহেবের ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠলো। নিজেকে সামলাবার জন্যে তিনি চুপ করলেন।

স্নেহাংশুও ভায়ের জন্যে অনেক দুঃখ করলেন। তাঁর বিশ্বাস, যে উদ্দেশ্যে শুভ্রাংশু বিলেত গিয়েছিলেন, নিজের কৃতকর্মের দোষে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বাপের কাছে মুখ দেখাবার লজ্জাতেই আর দেশে ফেরেননি। বাপের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে জানানো হয়েছিল। কেন যে তিনি পাননি বোঝা যাচ্ছে না। পেলে, ইউরোপে অত দুঃখ সহ্য না ক'রে তিনি নিশ্চয় সস্ত্রীক দেশেই ফিরতেন। সবই অদৃষ্ট!

সে কথা মেমসাহেবও স্বীকার করলেন।

কিন্তু—এই বাহ্য।

আসল কথা, শুভ্রাংশুর অংশের সম্পত্তি মেমসাহেব বিক্রি করে দিতে চান। স্নেহাংশু যদি নেন, তাহ'লেই সব চেয়ে ভালো হয়। তিনি অর্ধেক দামেই তাহ'লে ছেড়ে দেবেন। নইলে....

স্নেহাংশু নিলেন না এবং নানারকম টালবাহানা করতে লাগলেন।

তারপরে হঠাৎ একদিন শুনলেন, কুড়ি লক্ষ টাকার সম্পত্তি মাত্র এক লক্ষ টাকায় এক ইহুদীকে বিক্রি ক'রে মেমসাহেব বিলেত চলে গেছেন।

এরপরে আরম্ভ হ'ল সেই ইহুদীর সঙ্গে মামলা।

ইহুদী নিঃসহায় বিদেশিনী নয়। ঝানু ব্যবসায়ী। সুতরাং তাকে কাবু করা সহজ হ'ল না। অনেক দিন হাইকোর্টে ধস্তাধস্তির পর অবশেষে ঘোষেদের মর্যাদারক্ষার জন্যে সেই সম্পত্তি স্নেহাংশুকেই পোনেরো লক্ষ টাকায় কিনে নিতে হ'ল।

কিন্তু তাতেই জের মিটলো না।

তার মানে, সমস্ত টাকাটাই তাঁকে দেনা করতে হ'ল। এবং সে দেনা তিনি তো শোধ করতে পারলেনই না, তাঁর ছেলে হিমাংশু এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাই নিয়ে বিব্রত হয়ে রয়েছেন। সুদ যথাসম্ভব মেটানো হচ্ছে, কিন্তু আসলে এখনও পর্যন্ত বিশেষ হাত পড়েনি।

হিমাংশুকে নিয়েই এই কাহিনী।

ঘোষ পরিবারের এখন তিনিই কর্তা। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। রং নীলাভ গৌর। শীর্ণ দেহ, কিন্তু এখনও নুয়ে পড়েনি। সুপক্ক আমের মতো ঢলঢল মুখ। সেই মুখখানি এবং উজ্জ্বল, আয়ত চোখদুটি

দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের মনের মধ্যে গোলমাল নেই। দিলদরিয়া মেজাজ।

শ্রীমন্ত তার সব কিছুর জন্যে এই লোকটির কাছেই ঋণী। বাইরে শিকারে বেরিয়ে অনেক দিন আগে তিনি এই পিতৃমাতৃহীন সুদর্শন ছেলেটিকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন।

তখন শ্রীমন্তর বয়স দশ-এগারো বৎসর।

হিমাংশুই তাকে এনে নিজের পরিবারে স্থান দিয়েছিলেন। তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাকে নিজ পরিবারের একজনের মতোই রেখেছিলেন। তার খাওয়া-পরা, স্কুলকলেজের মাইনে, কোনো দুঃখই রাখেননি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে এই অবস্থায় বাইরের লোক অতি সহজেই পরিবারভুক্ত হয়ে যায়। আর বোঝাই যায় না, সে এই পরিবারেরই একজন নয়। অভিজাত পরিবারে তা সম্ভব নয়। অসংখ্য দাস-দাসী ও কর্মচারীদের ব্যবহার ও দৃষ্টি সকল সময়েই তাকে নিজের প্রকৃত মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্নেহপরায়ণ আশ্রয়দাতা ও স্নেহভাজন আশ্রিতের মধ্যে একটা স্থায়ী ব্যবধান অব্যাহত রাখার তারা আশ্চর্য কৌশল জানে।

শ্রীমন্তর থাকবার জন্যে নিজস্ব পৃথক ঘর, তার মূল্যবান জামা-কাপড়, ঘরের আবশ্যকীয় আসবাবপত্র, সর্বোপরি প্রিয়দর্শন চেহারা,—সবই ছিল। তবু সে এই অভিজাত পরিবারের মধ্যে মিশে যেতে পারেনি। বরং যতই বয়স বাড়তে লাগলো, ততই যেন এই পরিবারের থেকে সে দূরে সরে আসতে লাগলো।

মাট্রিকুলেশন পাস করার পর থেকেই অন্দরের মধ্যে তার যাতায়াত কমে আসতে থাকে। এখন একেবারেই যায় না। পরিবারে নতুন

বধূ কেউ আসেনি। তাকে নিষেধও কেউ করেনি। তবু যেতে পারে না। বোধ করি ওই দাসী-চাকর ও কর্মচারীদের ছুঁচ-ফোটানো দৃষ্টির জন্যেই।

হৈমন্তীও আগে দিনের বেলায় হামেসাই আসতো তার ঘরে। এখন ক্বচিৎ আসে। তাও লুকিয়ে, সকলের অজ্ঞাতসারে, শ্রীমন্তর অনুপস্থিতিতে।

তাকে নিষেধ করলে কে?

[ ৪ ]

বেলা তখন দশটা।

সরকার বালাখানা থেকে উঁকি দিয়ে ফিরে এল। বড়বাবু তখনও ওঠেননি।

এ-বাড়ীর দাসী-চাকর থেকে বাইরের মোসাহেবরা পর্যন্ত সকলেই হিমাংশুবাবুকে বড়বাবু বলে। বালাখানার পাশে যে ছোট ঘর, সেই ঘরে তিনি ছিলেন শুয়ে। বাইরের বালাখানায় যেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আনন্দ হয়, সে রাত্রে আর তিনি অন্দরে ফেরেন না। ওই ছোট ঘরটিতেই শুয়ে থাকেন।

তখনও তিনি ওঠেননি।

উঠলেন আরও এক ঘণ্টা পরে।

পুরাতন ভৃত্য রঘুয়া কাল রাত্রি থেকেই বড়বাবুর কাছে হামেহাল হাজির আছে। পানোন্মত্ত প্রভুর পরিচর্যায় সে পোক্ত হয়ে উঠেছে। কোন্ অবস্থায় কি করা দরকার সব জানে।

বড়বাবুর ঘুম ভাঙামাত্র সেই সব প্রক্রিয়া সে আরম্ভ ক'রে দিলে : গরম জল দিয়ে একটুখানি লেবুর রস, একটু মদ্য, একটু চা, খাবার, পরের পর একটি একটি ক'রে আরম্ভ হয়ে গেল।

তারপরে স্নান।

স্নানান্তে বড়বাবু বালাখানায় ফরাসে এসে বসলেন। সরকার এসে কতকগুলো কাগজে সই করিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর এলেন ম্যানেজার।

কথাটা ক'দিন থেকেই বলি-বলি ক'রে তিনি বলতে পারছিলেন না। কিন্তু বিষয়টা জরুরী। আর দেরি করা চলে না।

বললেন, বলছিলাম মৌজা হরিহরপুরের ব্যাপারটা।

—কি ব্যাপারটা ?

ম্যানেজার মাথা চুলকে বললেন, জানুয়ারী কিস্তি ফেল করেছি। এক সঙ্গে জানুয়ারী-মার্চ দুটো কিস্তি দিতে হবে।

বড়বাবু অবলীলাক্রমে বললেন, বেশ তো। দিয়ে দিন। টাকা নেই ?

ম্যানেজারের মাথা-চুলকানি বেড়েই চললো : সতেরো হাজার সাতশো তিরানব্বুই টাকা আট আনা ন'পাই-এর ব্যাপার !

বড়বাবুর মৌজ তখনও কাটেনি। এসব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ ভাল লাগছিল না। সন্ধ্যার পরে আসতে বললেন। সে সময় মেজাজ কেমন থাকবে, তাই বা কে জানে ?

ম্যানেজার অতঃপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

বড়বাবু ফরাসে আড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজখানা ওল্টাতে লাগলেন। যুদ্ধের খবরে তাঁর খুব উৎসাহ।

কিন্তু আজ আর যুদ্ধের খবরে তাঁর মন বসলো না।

কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে জার্মান সৈন্যদল। পোল্যাণ্ড শেষ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। গেল দুর্বল বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড। ফ্রান্সও যেতে বসেছে।

শুনতে রক্ত গরম হয়ে উঠে। কিন্তু হিমাংশুবাবু উৎসাহ পেলেন না। তাঁরও যেন যুদ্ধ চলেছে ঋণের সঙ্গে। ঝড়ের মতো হু হু শব্দে ঋণ এগিয়ে আসছে তাঁকে গ্রাস করবার জন্যে। পৈতৃক ঋণ তো আছেই, তার উপর নিত্য নতুন উপলক্ষে নতুন নতুন ঋণও মাঝে মাঝে হচ্ছে।

বিশেষ ক'রে এই জমিদারী।

এ যেন ঋণের উৎস হয়ে উঠেছে। একটা কিস্তি যাচ্ছে, আর একটা আসছে, তার পরে আর একটা। এর যেন আর শেষ নেই। প্রজারা খাজনা দেওয়া এক রকম বন্ধই করেছে। কর্তাদের আমলে প্রজাদের উপর শাসন ছিল। অবাধ্য প্রজার উপর মাঝে মাঝে শাসনের নামে নিষ্ঠুর অত্যাচারও হ'ত।

সেদিন আর নেই, সেদিন আর নেই!

দুশ্চিন্তায় হিমাংশুবাবুর সুন্দর ললাট রেখাঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে।

দুপুরে বড়বাবু খেতে বসলেন। বড় মেয়ে বাসন্তী তাঁর সামনে এসে বসেছে।

এই মেয়েটি হচ্ছে হিমাংশুবাবুর সবচেয়ে প্রিয়।

এত রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বিশেষ রূপের সঙ্গে গুণের এমন সমন্বয় বড় একটা দেখাই যায় না। কে জানে, বোধ হয় এত রূপ-গুণ স্বয়ং বিধাতারও সহ্য হ'ল না। তাই যত রূপ তিনি দিলেন, তার সঙ্গে দুঃখও জুড়ে দিলেন ততখানি।

হিমাংশুবাবু বাসন্তীর বিয়ে দিয়েছিলেন খুব ধুমধামের সঙ্গে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ বসু পরিবারে। ধনে-মানে-বিদ্যায় বসু পরিবার কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়। ধনপতি বসুর বড় ছেলের সঙ্গে বাসন্তীর বিবাহ হয়। তখন বাসন্তীর বয়স মাত্র এগারো।

কিন্তু সে সুখ বেশিদিন সইলো না। দুটি বৎসর যেতে না যেতে প্রথমে ধনপতি বসু এবং তারপরে তাঁর বড় ছেলেও দুরারোগ্য রোগে মারা গেলেন।

বাসন্তী তখন তেরো বৎসরের বালিকা।

আশ্চর্য মেয়ে! সেই বয়সেই সে যোগিনী সাজলে। বাপ-মায়ের কান্না তাকে নিরস্ত করতে পারলে না। অথচ ওই বয়সে কী-ই বা সে বুঝেছিল?

এর পর থেকে একাদিক্রমে সে শ্বশুর-বাড়ীতেই কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাপেরবাড়ী আসতো, কিন্তু বাপের সামনে দাঁড়াতো না। তার বৈধব্যবেশ হিমাংশুবাবু সহ্য করতে পারতেন না। অল্প কিছুদিন থেকে সে বাপের সামনে আসছে।

বাপের সঙ্গে দুটো কথা কইবার এইটেই সময়।

হাতের পাখাটা অনাবশ্যক একবার দুলিয়ে বাসন্তী বললে, হিমুর বিয়ের জন্যে বলছিলাম।

এই শিক্ষাটা বাসন্তীর শাশুড়ীর। তিনি বলেন, গুরুজনের খাওয়ার সামনে শুধু হাতে বসতে নেই। তাই শীতের দুপুরবেলা, তবু বাসন্তীর হাতে পাখা।

হিমাংশুবাবু খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলেন।

—তোর হাতে ভাল পাত্র আছে নাকি?

বাসন্তীর বালবৈধব্য দেখে হিমাংশুবাবু বাল্যবিবাহের উপর চটে

গেছেন। হৈমন্তীর বিবাহ সেইজন্যেই এখনও তিনি দেননি। এখন বাসন্তীর কথা শুনে মনে হ'ল, ভালো পাত্র পেলে তার বিয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত।

খুসি হ'য়ে বাসন্তী বললে, আমার দেওরের কথা বলছিলাম। এবারে এম-এ পাস করেছে। আসছে বারে ল' দেবে। ঠিক হয়েছে এটর্ণীগিরি পড়বে।

বড়বাবু আনন্দে খাওয়া ভুলে গেলেন।

ছেলেটি তাঁর দেখা। বাসন্তী এবাড়ী এলে সে মাঝে মাঝেই আসে। বাসন্তী না থাকলেও সে বাসন্তীর খবর নিয়ে এবাড়ী আসে। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। রংও খুব ফর্সা। বাসন্তীর বয়সী।

এমন ছেলে হাতছাড়া করা যায় না।

—ছেলে এখন বিয়ে করবে না শুনছিলাম যেন?

বাসন্তী হাসলে।

আজকালকার ছেলেদের ওই একটা চাল। ছেলে এখনও যে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, তা নয়। কিন্তু বাসন্তী তা আমল দিতে চায় না। ছেলের মা ভয় পান, দ্বিধা করেন। কিন্তু বাসন্তী ভয় পায় না।

বললে, শোনেন কেন ওসব কথা?

বড়বাবু সানন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথাও থেকে সম্বন্ধ আসছে না কি?

—আসেনি। কিন্তু আসতে কতক্ষণ? তাই বলছিলাম, অন্য কোনো সম্বন্ধ আসবার আগেই আপনি আমার শাশুড়ীর কাছে গিয়ে সব পাকাপাকি ঠিক ক'রে ফেলুন।

—বেশ তো।

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েই বড়বাবুর স্বর যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁর মনে পড়লো বাসন্তীর বিয়ের কথা। সে সব স্মৃতি স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেল ?

বাসন্তী এবং তার এই দেবর সুবিমল দু'জনে সমবয়সী। হয় বাসন্তী, নয় সুবিমল একজন অন্যের চেয়ে এক মাসের বড়। কিন্তু কে যে বড় সেটা কিছুতেই সুনিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে না। সুতরাং এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে গত তেরো বৎসরকাল যে কলহ চলে আসছে, আজও তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি।

স্বামীগৃহে এই দেবরটিই তার একমাত্র অবলম্বন এবং সান্ত্বনা। একেই নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ী, তার বর্তমান, তার ভবিষ্যৎ।

সেই ভবিষ্যৎ নিয়ে এই বয়সেই তার মনের কোণে গোপনে একটা দুশ্চিন্তা এসে জমেছে। বেটাছেলের পক্ষে চব্বিশ বৎসর বয়সটা ভবিষ্যৎ কেন, বর্তমান নিয়েও দুশ্চিন্তা করার বয়স নয়। কিন্তু মেয়েদের, বিশেষ ক'রে বাঙালী ঘরের বিধবা মেয়েদের মনের গতি স্বতন্ত্র। নিজেদের দুঃখময় অথচ পরমায়ু সম্বন্ধে তারা নিঃসংশয় হ'য়ে ওঠে এবং অল্প বয়সেই সেই সুদীর্ঘ ভবিষ্যতের কথা তারা ভাবতে শেখে।

বাসন্তীর শ্বশুর রাজার সম্পদ রেখে গেছেন। সুতরাং তার একবেলা হবিষ্যান্নের জন্যে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। জীবিতকালের জন্যে সেই সম্পত্তির অর্ধেকের সে অংশীদার। কিন্তু দেবরের সংসারে নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোকের জীবনস্বত্বের অর্থ কি ?

সুবিমলের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বে সে সন্দেহ করে না। তার লেশমাত্র কারণও এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। কিন্তু বিবাহের পরে পুরুষের মন ও

বুদ্ধির কত বড় পরিবর্তন সম্ভব, এই বয়সে সে নিজেই তো তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছে।

সেই তার চিন্তা।

সত্য কথা বলতে কি, সুবিমলের বিয়ের বয়স এখনও হয়নি। কিন্তু মায়ের আগ্রহে বিয়ে তাকে শীঘ্র করতেই হবে। কতদিন সে মায়ের ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে?

তাহ'লে এখনই-সে বিয়ে করুক না, তার বোন হৈমন্তীকে? তাতে আপত্তি করবার কি আছে? হৈমন্তী সুন্দরী, পাস-করা না হলেও লেখাপড়া মন্দ জানে না। দুজনে মানাবেও বেশ।

তাহ'লে হৈমন্তীকেই সে বিয়ে করুক না কেন?

তাতে বাসন্তী খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারে।

অপরিচিত, নিঃসম্পর্কীয় কোনো মেয়ে জা হ'য়ে এলে তার উপর বাসন্তী নির্ভর করতে পারে না। কিন্তু হৈমন্তী আর যা-ই করুক, তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তার সঙ্গে বিয়ে হ'লে সুবিমলের উপর চিরকালের জন্যে সে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারে।

এই বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই সে ছুটে এসেছে বাপের বাড়ীতে। কার্যোদ্ধার হ'য়ে যাওয়া মাত্রই সে শ্বশুরবাড়ী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

বাসন্তী কতদিন পরে এসেছে। এর মধ্যে তাকে ছেড়ে দেবে কে? মা এখনো বেঁচে।

কিন্তু শাশুড়ীর দোহাই দিয়ে বাসন্তী মায়ের হাত থেকে যদি বা নিষ্কৃতি পেলে, ছোট ভাই শঙ্কর এসে পথ আগলে দাঁড়ালো।

—তুমি পাগল হয়েছ বড়দি? কাল বাদে পরশু আমার সরস্বতী পূজো। তার আগে তোমার যাওয়া হয়?

—তার আগে আবার আমি আসবো রে পাগলা!

মাথা নেড়ে শঙ্কর বললে, তেমন বোকা আমাকে তুমি পাওনি বড়দি। তোমাকে আমি খুব চিনি। সরস্বতী পূজোর আগে তোমার যাওয়া হ'তেই পারে না।

[ ৫ ]

হৈমন্তী মুখ শুকিয়ে বেড়ায় কেউ জানে না কেন।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, তোর মুখ অমন শুকনো কেন রে? জ্বর হয়নি তো?

হৈমন্তী জোর করে বললে, না।

সময়টা খারাপ। চারিদিকে বসন্ত হচ্ছে। সুতরাং ছোট্ট একটুখানি উত্তরে মা সান্ত্বনা পেলেন না।

বললেন, এদিকে স'রে আয় তো দেখি।

বিরক্তভাবে হৈমন্তী কাছে স'রে এল। হাত দিয়ে তার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে তিনি নিশ্চিন্তভাবে নিজের কাজে চলে গেলেন: না, জ্বর হয়নি।

কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই।

খানিক পরেই বাসন্তী তাকে দেখে চম্‌কে উঠলো: তোকে অমন লাগছে কেন রে? জ্বর নাকি?

—হ্যাঁ।

বলে হৈমন্তী তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। সে জানে তার জ্বর নয়। কিন্তু জ্বরের মতো। তার কিছুই ভালো লাগছে না।

বিকেলে শ্রীমন্ত যখন একবার বেরিয়ে গিয়েছিল, হৈমন্তী একখানা চিঠিতে সব কথা লিখে তার বিছানার তলায় রেখে এসেছে। কে জানে সে চিঠি তার চোখে পড়েছে কি না। শ্রীমন্ত আজকাল যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে! বেশ-ভূষায় কেমন যেন বিশৃঙ্খল। বোধ করি পরীক্ষার দুশ্চিন্তায়। কে জানে কেমন তার পড়া তৈরি হ'ল।

হৈমন্তী রেগে যায় ওর ওপর। মানুষের জীবনের চেয়ে কি পড়ার দাম বেশী? ভালোবাসার চেয়েও?

আর শুয়ে থাকতে পারলে না সে। গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে চুপি চুপি ছাদে চলে গেল। কি জানি কেন, সবাইকে তার এড়িয়ে চলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

শেষ শরতের অপরাহ্ন।

সীসার মতো মলিন আকাশে সূর্যাস্তের বর্ণ-সমারোহও যেন তেমন জমছে না। বড়লোকের প্রসাদী পুরানো মূল্যবান পোষাক-পরা গরীবকে যেমন দেখায় তেমনি। উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ,—তিন দিক থেকে একটা কালো পাৎলা পর্দা সেই বর্ণাঢ্যতাকে ছুটে গ্রাস করতে আসছে।

দূরে পশ্চিম দিগন্তে উড়ছে ক'টা কালো কালো পাখী। নীড়ে ফিরে চলেছে বোধ করি। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হৈমন্তীর মন যেন আরও উদাস হয়ে গেল।

আলিসায় ভর দিয়ে অভিভূতের মতো একদৃষ্টে সেই দিকেই সে চেয়ে রইল।

হঠাৎ এক সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দে এবং কাদের যেন কলকণ্ঠে সে সচকিত হয়ে উঠলো।

বড়দিদি আর সুবিমল!

সুবিমল তার অপরিচিত নয়। এ বাড়ীতে তার প্রায়ই আসা-

যাওয়া। দিদির দেওর হিসাবে হৈমন্তী তার সঙ্গে কত রসিকতা করেছে, ক্যারম খেলেছে, গল্প করেছে। কিন্তু এখন তাকে দেখামাত্র হৈমন্তীর মন যেন হঠাৎ বরফের মতো জমে গেল।

বাসন্তী বললে, কি রে, তোর না জ্বর হয়েছে? ঘরে গিয়ে শুয়েছিলি না? হঠাৎ ছাদে ঠাণ্ডায় চলে এলি যে!

হৈমন্তী ফিকে একটু হাসলে। বললে, জ্বর কে বললে? মাথাটা কেমন ধরেছে, ভাই।

—মাথা ধরার ওষুধ জানি আমি। সুবিমল হাসতে হাসতে বললে।

—কি?—বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলে।

—ক্যারম খেলা।—সুবিমল গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে।

ওরা দু'জনই হেসে উঠলো।

ক্যারম হৈমন্তীর একটা নেশা। ক্যারমের নামে মনের বরফ যেন গলতে লাগলো।

ভুরু কুঁচকে বললে, তবু যদি খেলতে জানতেন!

এর উত্তরে সুবিমল শুধু একটা অট্টহাস্য ক'রে উঠলো। বললে, চলো, গোটা কয়েক নতুন মার তোমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাই।

দুজনে বেধে গেল কলহ।

সেই উত্তেজনায় ওরা দুজনে বাসন্তীর দুখানা হাত ধরে নিচে নিয়ে গেল। সে হবে ওদের খেলার বিচারক।

কি জানি কেন, খেলা তেমন জমলো না।

অনেকগুলো সহজ মার হৈমন্তীর ফসকে গেল। তার আঙুল কাঁপছে। বাসন্তী বুঝতে পারছে কেন। কিন্তু সুবিমল কিছুই জানে না, সরু সরু লম্বা আঙুল দিয়ে সে চমৎকার ষ্ট্রাইক করছে। আজকে তার হাত যেন আরও খুলে গেছে।

কিন্তু হৈমন্তী পারছে না।

একদৃষ্টে সে সুবিমলের চাঁপার কলির মতো সুন্দর আঙ্গুলের দিকে চায়। শ্রীমন্তও সুপুরুষ। কিন্তু তার আঙ্গুল এমন সুন্দর নয়। দিনমজুরের মতো শক্ত-শক্ত, মোটা মোটা তার আঙ্গুল। এমন সূক্ষ্মাগ্র নয়।

উভয়েই সুন্দর। কিন্তু সুবিমলের মুখে যে অভিজাত সৌকুমার্য আছে, শ্রীমন্ত তা কোথায় পাবে?

খেলার অবসরে হৈমন্তী মনে-মনে উভয়ের মধ্যে তুলনা ক'রে দেখে। বিদ্যা, বিত্ত, রূপ কোন দিক দিয়েই সুবিমলের সঙ্গে শ্রীমন্তের তুলনা চলে না। শ্রীমন্ত অনেক ছোট, অনেক নিচে। সে এই বাড়ীর একজন আশ্রিত ছাড়া আর তো কিছুই নয়। আর সুবিমল এই মহানগরীর একটি অভিজাত বংশের সুশিক্ষিত যুবক। আচারে ব্যবহারে নিখুঁত।

কিন্তু সুবিমলের সান্নিধ্য তাকে আনন্দ দিতে পারে না কেন? তার এত কাছে বসেও ওর মন চঞ্চল হ'য়ে উঠছে কই? খেলার ছলে দুজনের আঙ্গুলে আঙ্গুলে ঠেকে গেলে দেহে শিহরণ জাগে না কেন?

হৈমন্তী ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়। খেলার ভুল করে। সহজ মার ফসকে যায়। বাসন্তী হাসে। সুবিমল ব্যঙ্গ করে। হৈমন্তী লজ্জা পায়। আবার মন দিয়ে খেলবার চেষ্টা করে। পারে না।

সুবিমল সুন্দর, আশ্চর্য সুন্দর। একতাল গলিত কাঁচা সোনার মতো ঢলঢল। আর শ্রীমন্ত যেন পাথর। তার মূল্য বেশি নয়। কিন্তু কোথায় যেন তার মধ্যে একটা কঠিন অদম্য শক্তির উৎস আছে। তার পুরু-পুরু ঠোঁটে, ছোট-ছোট তীক্ষ্ণ চোখে এবং মোটা বেঁটে লোহার শিকের মতো আঙ্গুলের ফাঁকে যেন সেই শক্তি লুকানো আছে। সেখানে, সেই শক্তির ক্ষেত্রে সুবিমল তার কাছে কতটুকু?

শ্রীমন্ত এই বাড়ীর আশ্রিত। পোষা বাঘের মতো সে হৈমন্তীর পায়ের তলায় বসে থাকে। হৈমন্তীর ভালো লাগে। সে ওকে ভালোবাসে……এবং একটু বোধ করি যেন ভয়ও করে। ওকে তার অদেয় কিছুই নেই।

আর এই সুবিমল……মোমের পুতুলের মতো আশ্চর্য সুন্দর এই সুবিমল……একে নিয়ে সে করবে কি? মনের আলমারীতে ঝেড়ে-মুছে সাজিয়ে তুলে রেখে দেবে?

হৈমন্তী একটা অ্যাঙ্গল্ মারতে গিয়ে পারলে না।

সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

হঠাৎ রেগে গিয়ে হৈমন্তী ক্যারমের বোর্ডখানাই উলটে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা হৈ হৈ করে উঠলো।

সে চীৎকারে বাসন্তীর মা পর্যন্ত কৌতূহল রাখতে না পেরে ছুটে এলেন:

—কি হ'ল রে তোদের?

বাসন্তী হাসতে হাসতে বললে, খেলায় না পেরে হিমু বোর্ড উলটে দিয়ে ছুটে পালালো।

—কার সঙ্গে খেলছিল?

—ঠাকুরপোর সঙ্গে।

শুনে নয়নতারা হাসতে হাসতে পালালেন। আজকালকার ছেলে-মেয়েগুলো যেন কী! না লজ্জা, না শরম। কিন্তু তার জন্যে তিনি দুঃখিত হলেন বলেও মনে হ'ল না।

অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট ক'রে হৈমন্তী আর পারলে না।

রাত তখন ছুটো। পাশেই বাসন্তী শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দেখতে দেখতে দিদিটা কি মোটা হচ্ছে! আর কী ঘুমুতেই পারে! সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর সাড়া পাওয়া যাবে না। আর কী নাকটাই ডাকে! মোটা হওয়ার জ্বালা কম নয়!

হৈমন্তীর ঘুম আসে না কিছুতে।

সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। রাজপথে শব্দ নেই। হৈমন্তীর মাথার মধ্যে অসংখ্য দুশ্চিন্তা যেন সাপের মতো কিলবিল করছে।

আস্তে আস্তে সে উঠে বসলো।

শ্রীমন্ত তাকে তার ঘরে আসতে নিষেধ করেছে। সে ভয় পায়। অথচ শ্রীমন্তকে তার বিশেষ প্রয়োজন। তার সঙ্গে অনেক আলোচনা করার আছে।

কি করছে এখন সে?

ঘুমোয়নি নিশ্চয়ই। হয়তো পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে রাত জেগে। নয়তো ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে ষ্টোভে কফি তৈরি করছে।

হৈমন্তী অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

দিদি জানতে পারবে না তো?

জানে জানুক, কাউকে সে ভয় করবে না।

অন্ধকার রাত্রি। কিন্তু শ্রীমন্তের ঘর পর্যন্ত এই রাস্তাটা তার একেবারে মুখস্থ। দূর থেকেই দেখতে পেলে শ্রীমন্তর ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। আস্তে আস্তে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলে শ্রীমন্ত টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে কি, কি করছে বোঝা যাচ্ছে না।

ক্লান্ত বোধ করি।

পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। হৈমন্তী জানে এই পরীক্ষাটা

পাস করবার জন্যে কি ভীষণ পরিশ্রম সে গেল ক'মাস থেকে করছে। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে কতটুকু সময়ই বা সে ঘুমোয় ?

শ্রীমন্তের প্রতি মমতায় হৈমন্তীর মন কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

নিঃশব্দে দরজটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে ওর শিয়রে এসে সে দাঁড়ালো।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে শ্রীমন্ত। টেবিল-ল্যাম্পের নিচে খোলা রয়েছে তার পড়ার বই। তারই আধখানায় মাথা রেখে ক্লান্ত হ'য়ে ও ঘুমুচ্ছে।

হৈমন্তীর আসা টেরও পেলে না।

কী রোগা হয়ে গিয়েছে শ্রীমন্ত! অনেক দিন হৈমন্তী আসেনি এ-ঘরে। অনেক দিন ওর দিকে ভালো.ক'রে এমন পরিপূর্ণ আলোয় চেয়ে দেখেনি।

ওর পেশীবহুল লোহার মতো শরীরের এ কী অবস্থা হয়েছে! সব যেন ঢিলে হয়ে গিয়েছে। ব্যায়াম করার ফলে মুখখানি তার কখনই খুব ভরন্ত নয়। এখন যেন একেবারেই চুপ্‌সে গিয়েছে। নিমীলিত চোখে অপরিসীম ক্লান্তি। রুগ্ন দেহে শুধু হাড় সার হয়েছে।

এ কী দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করেছে শ্রীমন্ত! বিদ্যার জন্যে অমন দেবদুর্লভ স্বাস্থ্য পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বসেছে!

ওকে জাগাতে হৈমন্তীর মমতা হ'ল। নিঃশব্দে ফিরে যেতেও মন সরলো না। এই অবসরে ওকে একটুখানি সেবা করার লোভ হৈমন্তীর পক্ষে দুর্জয় হয়ে উঠলো। পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ওর মাথার বড় বড় কোঁকড়া চুলে হাত বুলোতে লাগলো।

সে স্পর্শে শ্রীমন্তের চোখে ঘুম বেশি ক'রে জড়িয়ে আসারই কথা। কিন্তু মাথায় তার পরীক্ষার দুর্ভাবনা। নিশ্চিন্তে ঘুমাবার এখন

অবসর নেই। একটু পরেই সে চমকে মাথা তুলে চোখ মেলে চাইলে!

—হৈমন্তী!

ওর চোখ ঘুমের জন্যে তখন জবাফুলের মতো লাল।

হৈমন্তী হাসলে। বললে, উঠলে কেন? শোও না আর একটু।

সামনের খোলা বইখানার দিকে শ্রীমন্ত একবার চাইলে। বললে, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না?

অপ্রস্তুতভাবে ধড়মড় ক'রে সে উঠে দাঁড়াল। হৈমন্তীকে একটু আদর করলে। বললে, দাঁড়াও, একটু কফি তৈরী করি আগে। ঘুমে চোখ মেলে যেন চাইতে পারছি না।

হৈমন্তী ধমক দিলে। বললে, না। আর কফি তৈরী করতে হবে না। অনেক রাত্রি হয়েছে। শুয়ে পড়। শরীর কি হয়েছে একবার দেখ দেখি।

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, শরীরের জন্যে ভেবো না হিমু। পনেরো দিনে সেরে নোব। কিন্তু এই পরীক্ষায় আমাকে পাস করতেই হবে।

শ্রীমন্ত ষ্টোভ জ্বালিয়ে জল চড়িয়ে খাটের উপর হৈমন্তীর পাশে এসে বসলো। বুঝলে, তার অবাধ্যতায় হৈমন্তী ক্রুদ্ধ হয়েছে।

ওকে শান্ত করবার জন্যে বললে, এই ক'টা দিন আমাকে কিছু বোলো না। আর ক'টা দিনই বা!

মুখ ভার ক'রে হৈমন্তী বললে, পরীক্ষা পাস করা কি এমনই দরকারী যে তার জন্যে শরীর পর্যন্ত পাত করতে হবে?

—সকলের জন্যে হয়তো নয় হিমু। কিন্তু যাদের বাপ-মা নেই, নিরাশ্রয়,—পরের বাড়ীতে যারা মানুষ হচ্ছে, তাদের পক্ষে এমনই দরকারী।

শ্রীমন্তের পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় অবস্থার কথায় হৈমন্তী চিরকাল চুপ ক'রে গেছে। আজও সাড়া দিলে না।

শ্রীমন্ত বলতে লাগলো :

—হৈমন্তী, যদি ভেবে থাকো বিদ্যার জন্যে আমি এই পরিশ্রম করছি, তাহ'লে ভুল করবে। বিদ্যায় আমার বিশেষ লোভ নেই। বিদ্বান হবার শক্তি আমাকে ভগবান দেননি। আমাদের সমাজে·বিদ্বানের মূল্যও বেশি নয়। কিন্তু আমাকে বড় হতে হবে। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে হবে। সকলের মাথার উপর উঠতে হবে। আমি ভেবে দেখেছি, আজকের সমাজে সে কিছুই শক্ত নয়।

এবারে হৈমন্তী হেসে ফেললে। সে· বিশ্বাস করতে পারলে না যে, বড় হওয়া এতই সোজা। 'সে গিয়ে কফি তৈরী করতে বসলো।

কিন্তু তার হাসি শ্রীমন্ত বোধ হয় দেখতে পেলে না। সে আপন-মনেই বলতে লাগলো :

—কিছু শক্ত নয় হিমু। শুধু ক'টা জিনিস দরকার। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নির্বিচার হ'তে হবে। আর কিছু পরিমাণে নির্লজ্জ হ'তে হবে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে—

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—
তিন থাকতে নয়।

কথাটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও সত্যি। আমার বিশ্বাস, এই তিনটেই আমার নেই·। আমার বড় হওয়ার পথ তৈরি হয়েই আছে। ছেলেবেলা থেকেই আমি পিতৃমাতৃহীন। আমার আপনার কেউ নেই। সুতরাং কিসের লজ্জা, কোথায় দ্বিধা, ভয় করবারই বা কারণ কি ?

বলতে-বলতে ওর চোখ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো।

কফি তৈরী করতে করতে হৈমন্তী চমকে থমকে গেল। শ্রীমন্তের ছোট ছোট চোখে যেন সাপের হিংস্র দৃষ্টি!

সে স্তব্ধ হ'য়ে গেল; শ্রীমন্তের এই রূপ এর আগে কখনও দেখেনি। যে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা সে করতে এসেছিল, তার কিছুই হ'ল না। নীরবে এক পেয়ালা কফি শ্রীমন্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, তুমি খাবে না কফি?

হৈমন্তীর কেমন যেন মাথা ঝিমঝিম করছে। সব গোলমাল লাগছে। ফিকে একটুখানি হেসে বললে, সর্বনাশ! এমনিতেই আমার চোখে ঘুম নেই, তার উপর কফি?

সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

[ ৬

হৈমন্তীর সঙ্গে সুবিমলের বিয়ের ঠিক হতে বিলম্ব হ'ল না। জানা ঘর, সুন্দরী মেয়ে, তার উপর নিজেদের মধ্যে। বিশেষ সুবিমলের মা ছেলের বিয়ের জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং হিমাংশুবাবু নয়নতারাকে নিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হওয়ামাত্র তিনি রাজি হ'য়ে গেলেন।

বললেন, আমাদের কাল শেষ হয়ে এসেছে? মিথ্যে আমার কাছে মত নিতে এসেছেন বেয়াইমশাই। মত নিন্‌গে ছেলের কাছে, আর ওই যে আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বড়বৌমা ওঁর কাছে।

নয়নতারা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন: সে যা বলেছেন বেয়ান। আজকাল ছেলেতে মেয়েতে বিয়ে। বাপ-মাকে নিমন্ত্রণ করলে তাঁরা গিয়ে ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়ে দেবেন। না কি বলুন?

সঙ্গে-সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল একাল আর সেকাল সম্বন্ধে। কি কালই না ছিল তখন!

সেই অবসরে বাসন্তী ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, পাত্রের মতটা জেনে আসি।

আশ্চর্য এই যে, বাসন্তী কথাটা পাড়ামাত্র স্থবিমল তার এবং মায়ের উপর সমস্ত ভার দিয়ে দিলে। একবারও তার পুরানো বাঁধাগতের আপত্তি তুললে না। সেদিন ক্যারম খেলার শেষে হৈমন্তীর ক্রুদ্ধ পরাজিত মুখভাব সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

এত সহজে যে স্থবিমল রাজি হয়ে যাবে, তা বাসন্তী স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছিল, স্থবিমল অনেক বিদ্রূপ-পরিহাস করবে, অনেক সঙ্গত-অসঙ্গত আপত্তি তুলবে, অনেক ধানাই-পানাই ক'রে বাসন্তীকে নাস্তানাবুদ করবে। বাসন্তী রাগ করবে, তিরস্কার করবে এবং শেষ পর্যন্ত কাঁদবে, তবে সে রাজি হবে।

কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না। এমন কি এই নিয়ে স্থবিমল একটা সহজ পরিহাস পর্যন্ত করলে না। সমস্ত ভার এমন গম্ভীরভাবে তাদের দুজনের উপর ঝেড়ে দিলে যে, বাসন্তী প্রথমটা শুধু বিস্মিত নয়, একটু দ্বিধাগ্রস্তও হ'ল।

বললে, বেশ। আমার আর মায়ের খুব মত আছে। এর পরে তুমি আর কোনো আপত্তি তুলবে না তো? পরিষ্কার করে বলো।

এতক্ষণে স্থবিমল একটু হাসলে। বললে, পরিষ্কার করেই তো বললাম বৌদি। তোমাদের মত হ'লে আমার কোনো আপত্তি নেই।

—ঠিক তো?

—ঠিক।

বাসন্তী ছুটতে ছুটতে এসে সুখবরটা ওঁদের দিলে। শুনে ওঁরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

হিমাংশুবাবু হাত জোড় ক'রে বললেন, তাহলে বেয়ান, এই ফাল্গুনেই যাতে শুভ কাজ হয়ে যায়, তার চেষ্টা করা যাক। আজকালকার ছেলে-মেয়ের মতিগতি!

—সে ঠিকই বলেছেন বেয়াই। আমি এখনই ঠাকুর মশাইকে খবর দিচ্ছি।

সতেরো বছর পরে এই বাড়ীতে আবার বিয়ের নহবৎ বসবে। সুবিমলের মায়ের চোখ দিয়ে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়লো। তাঁর আর সবুর সইছিল না। পুরোহিতকে ডেকে সেই মুহূর্তেই কোষ্ঠী বিচার হয়ে গেল। কোষ্ঠী মিলতেই উভয়পক্ষের আশীর্বাদের এবং বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল। দুটি অভিজাত ধনী পরিবারের মধ্যে দেনা-পাওনার প্রশ্ন অবান্তর। বিশেষ কুটুম্বের ঘর। সুতরাং সে প্রশ্ন উঠলো না। এক কথায় সমস্ত পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেল।

বসু-গৃহিণী মধ্যাহ্ন ভোজন না করিয়ে সেদিন আর বেয়াই-বেয়ানকে ছাড়লেন না।

কিন্তু শ্রীমন্ত কোথায়?

বিবাহের সংবাদ হৈমন্তী নিঃশব্দে শান্তভাবেই গ্রহণ করেছিল। শ্রীমন্তের চোখে সেই রাত্রে সাপের মতো হিংস্র যে জ্বালা দেখেছিল, তাতে সে কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সুতরাং প্রথম দিকে সুবিমলের সঙ্গে বিবাহের সংবাদ শান্তভাবে গ্রহণ করতে তাকে চেষ্টা করতে হয়নি। সহজেই পেরেছিল।

তারপরে যত দিন কাছে আসতে লাগলো ততই যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

কিন্তু শ্রীমন্ত কোথায়?

তার পরীক্ষা দিন কয়েক আগে শেষ হয়ে গেছে পড়ার চাপ আর নেই। তবু সে যে কি করছে, কোথায় থাকছে, কখন আসছে, কখন যাচ্ছে তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

সে এখানে আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। দিন দুই আগে গভীর রাত্রে হৈমন্তী তার ঘর তালাবন্ধ দেখে ফিরে এসেছে।

আশ্চর্য এই লোকটি!

ও কি বিয়ের কথা কিছুই শোনেনি? শুনে কি ওর মনে এতটুকু ঈর্ষারও উদ্রেক হয়নি? ওর নির্বিকার ভাব দেখে হৈমন্তী যেমন অবাক হচ্ছে, তেমনি কষ্ট পাচ্ছে।

অথচ শ্রীমন্তকে তার বিশেষ প্রয়োজন। মনের সঙ্গে যুদ্ধে সে ক্ষতবিক্ষত। তাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র শ্রীমন্ত। কিন্তু কে জানে সে কোথায়। পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো জানা যেতে পারে। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে তার লজ্জা করে।

অবশেষে একদিন শ্রীমন্তর পাত্তা পাওয়া গেল। দিন দশ বারো কলকাতায় সে ছিলই না। বড়বাবুই তাকে পাঠিয়েছিলেন মফঃস্বলে জমিদারীতে। কেন কেউ জানে না। সকালে সে ফিরেছে।

আড়াল থেকেই সে দেখলে, দুপুরে খেয়েদেয়ে শ্রীমন্ত ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। রেল ভ্রমণে ক্লান্ত হয়তো। দুপুর রাত্রে ওর ঘরে গিয়ে হৈমন্তী উপস্থিত হ'ল।

শ্রীমন্ত তখনও ঘুমোয়নি। দিনে প্রচুর ঘুমনোর জন্যেই বোধ করি ঘুম আসছিল না।

ঘরে আলো জ্বলছিল।

সেই আলোয় হৈমন্তী এসে যখন দাঁড়ালো, শ্রীমন্ত চমকে উঠে বসলো।

এক মুহূর্তে সমস্ত ঘর যেন ঝলমল ক'রে হেসে উঠলো।

হৈমন্তী সুন্দরী, রূপসী। কিন্তু তার এত রূপ শ্রীমন্ত কখনও দেখেনি।

পরণে তার ফিকে গোলাপী রঙের একখানা জর্জেট। সর্বাঙ্গে মূল্যবান জড়োয়া গহনা থেকে আলো ঠিকরে বার হচ্ছে। প্রসাধনের গন্ধ উঠছে ভুর্‌ভুর ক'রে। একটা অপরূপ ভঙ্গীতে দরজার গোড়ায় সে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু শ্রীমন্ত যেন পাথর হ'য়ে গেছে। তার সাধ্য নেই উঠে গিয়ে হৈমন্তীর হাত ধরে নিয়ে আসে।

ওর প্রস্তরীভূত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে শুধু একটি শব্দ বার হ'ল : এসো।

সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবানের যে মোহিনী-রূপ দেখে সুরাসুর উন্মাদ হ'য়ে উঠেছিল, সেও বোধ করি এমনি।

হৈমন্তী কলকণ্ঠে হেসে উঠলো : তবু ভালো যে, আসতে বললে! আমি এটুকুও প্রত্যাশা করিনি।

কণ্ঠস্বরে সূচের মতো খোঁচা ছিল। কিন্তু শ্রীমন্ত তা গায়ে মাখলো না।

হেসে বললে, বটে! যার জন্যে খেটে মরি সেই বলে চোর!

হৈমন্তী বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, আমার জন্যে খেটে মরছ তুমি? কি রকম খাটুনি শুনি?

শ্রীমন্ত বললে, শুনবে? শোনো তা'হলে। বড়বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে। ধূমধাম করেই হবে। অন্ততঃ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে। সেই টাকাটা জোগাড় করতে গিয়েছিলাম। সেও কি এক জায়গায়? কখনও রেলে, কখনও ষ্টীমারে, কখনও নৌকায়, কখনও বা হেঁটে।

কোনো দিন খাওয়া হয়েছে, কোনো দিন চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে কেটেছে, কোনো দিন তাও জোটেনি। আরও শুনবে?

—না। আমি ভাবছি, তোমার মনে কি লজ্জা ঘৃণা বলতে সত্যিই কিছু নেই?

—না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমার জীবনের নীতি হচ্ছে : লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।

শ্রীমন্ত মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

হৈমন্তী দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। বললে, লজ্জা করে না তোমার হাসতে? তোমার জিনিস অন্যে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে কোনো দুঃখ, কোনো ক্ষোভ নেই তোমার?

—'কোনো দুঃখ, কোনো ক্ষোভ নাই সুলক্ষণে'।—তারপরে পরিহাস বন্ধ ক'রে শ্রীমন্ত বললে,—তাহ'লে শোনো বলি : পথের কুকুর আমি। এরই মধ্যে দু'দিনের জন্যেও যদি তোমায় পেয়ে থাকি, সেই আমার ঢের। তারও চেয়ে বেশি যদি লোভ করি, নিজেও ডুববো, তোমাকেও ডোবাব।

হৈমন্তী তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বললে, দেখ, তোমাকে আমি চিনি। তাই তুমি যে ডুববে না, সেই কথাটা বোঝাবার জন্যেই এই ক'খানা জড়োয়া গয়না আজ পরে এসেছি। এর দাম জানো?

—না। জানবার দরকারও নেই। তবে আমাকে যদি চিনেই থাক, তাহ'লে তোমায় বলি শোনো, ওর লোভে যারা ভুল করতে পারে, আমি তাদের চেয়েও চালাক।

ব্যাকুল কণ্ঠে হৈমন্তী বললে, তুমি আমার কথাটাও কি ভাববে না? তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, এও কি আমাকে মুখ বুজে সইতে হবে?

—কিছুই বলতে হবে না হিমু। সবই ছু'দিন পরে সয়ে যাবে। মানুষের মন বড় আশ্চর্য জিনিস! হাঃ হাঃ হাঃ! বিবেকানন্দ পড়েছ? 'পুত্রশোকাতুরা নারী বৎসরান্তে পুনরায় পুত্রবতী হয়।' (ওর চোখে আবার সেই সাপের মতো হিংস্র জ্যোতিঃ!) যাক গে, বাজে কথা। তোমায় একটু কফি ক'রে খাইয়ে দি, আজ শেষবারের মতো। কফি আমি ভালো তৈরি করি, কি বল?

আশ্চর্য সহজ ওর কণ্ঠস্বর! যেন কিছুই হয়নি। যেন প্রতিদিনের মতো আজও এসেছে হৈমন্তী।

বিস্ময়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে এবং বেদনায় হৈমন্তীর সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে গেল। ওর যেন সমস্ত সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেছে, এমনি অবশভাবে বসে রইল। কিছুক্ষণের জন্যে ওর বাক্‌শক্তি পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের জন্যে।

শ্রীমন্ত নিঃশব্দ মনোযোগের সঙ্গে কফি তৈরি করলে। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর থেকে একটা রাত্রেও ওর কফি খাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। রাত তো জাগতে হ'ত না। তার উপর পরীক্ষা শেষের অব্যবহিত পরেই তাকে হৈমন্তীর বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছিল।

অনেক দিন পরে আজ আবার গভীর রাত্রে কফি তৈরি করতে ব'সে তার মনে হ'ল, অনেক দিনের অভ্যাসে এই জিনিসটা তার নেশাতেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ এর মধ্যে একদিনও সে কফির অভাব অনুভব করেনি। আশ্চর্য নয়?

নেশাখোর বহুদিনের পর নেশার বস্তু পেলে তার যেমন সমাদর করে, তেমনি সমাদরে ছু'পেয়ালা কফি সে পরিপাটি ক'রে তৈরি করলে।

প্রথম পেয়ালা যখন সে হৈমন্তীর হাতে তুলে দিলে, তখন তার চোখ যেন মিট মিট ক'রে হাসছে,—সেই সাপের মতো হিংস্র, ধারালো ছোরার মতো ঝকঝকে চোখ!

মুহূর্ত মধ্যে নিদারুণ ঘৃণায় হৈমন্তীর অবশ দেহের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎবেগে যেন আভিজাত্য-নীল উষ্ণ রক্ত ঝিলিক মেরে গেল! হাতের পেয়ালা ছুঁড়ে দিলে মেজের উপর ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে। বাসি রক্তের মতো চকোলেট রঙের কফি ছিটিয়ে পড়লো চারদিকে। ওর মুখে কে যেন হঠাৎ মাখিয়ে দিয়েছে সিন্দুর। স্ফীত নাসিকা উত্তেজনায় কাঁপছে।

বললে: ছিঃ! ছিঃ! তোমার হাতের ছোঁয়া খেলেও পাপ হয়। তুমি শয়তানেরও অধম। শয়তানেরও হয়তো হৃদয় আছে, তোমার তাও নেই। ছিঃ! ছিঃ! তোমায় দিয়েছিলাম ভালোবাসা?

তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে এল হৈমন্তী দরজার কাছে। দু'হাত বাড়িয়ে শ্রীমন্ত ওকে আটকালে।

তার চোখে সেই হাসি!

শান্ত কণ্ঠে বললে, কালকে গোটা কুড়ি টাকা পাঠিয়ে দেবে হিমু? হাতে কিছু নেই।

—দোব, দোব, দোব।

হৈমন্তীর গা'টা ঘিন ঘিন ক'রে উঠলো। ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে সে বিছানার উপর যেন ভেঙে পড়লো।

তারপরে কী কান্না! যেন অশ্রুর সমুদ্রকে কে তীরের বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছে!

কিন্তু কেন কাঁদে সে? ভালোবাসা, না ঘৃণা?

হ্যারিসন রোডের একটা মেস।

শ্রীমন্ত বি-এ পাশ করেছে এবং সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে একটা চাকরি পেয়েছে। এর জন্যে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। যুদ্ধের জন্যে বহু লোক নিচ্ছে। সুতরাং তার পক্ষে সেখানে একটা চাকরী যোগাড় করা বিশেষ কিছুই কঠিন হয়নি।

এর পরেও সে অবশ্য 'দেবধামে' যথাপূর্ব থেকে যেতে পারতো। বড়বাবু সত্যিই তাকে ভালোবাসেন। সুতরাং সেখানে থেকেযাওয়া তার পক্ষে কিছুই অসুবিধাজনক হ'ত না। পয়সার দিক দিয়েও সুবিধা হ'ত।

কিন্তু অতখানি সে পারলে না।

হৈমন্তী সে রাত্রের পরে আর একদিনও দেখা দেয়নি। মহাসমারোহে তার বিবাহ হয়ে গেল। তাতে শ্রীমন্ত সাধ্যেরও অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে। বরবধূ ফিরে এল। ক'দিন ধ'রে বাড়ীতে খুব হৈ চৈ চললো। পরিশ্রান্ত শ্রীমন্ত সে ক'টাদিন এক রকম ঘুমিয়েই কাটালে। বিশেষ অসুবিধা টের পেলে না।

কিন্তু বৈশাখের প্রথমেই যেই হৈমন্তী চলে গেল, এই বাড়ীর সঙ্গে শ্রীমন্তর যোগসূত্র যেন হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল। কিছু যেন তার ভালো লাগে না। অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় হঠাৎ যেন একটা ছেদ পড়েছে।

সমস্ত দিন লাটাই-ছেঁড়া ঘুড়ির মতো অনির্দেশ্যভাবে কলকাতার রাজপথে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে শ্রান্তদেহে শোয়, তবু ঘুম আসে না।

এ তো ভালো নয়। শ্রীমন্ত নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝাবার আছে কি, তাও ভেবে পায় না।

এই অবস্থায় কিছুদিন কাটলো। তারপরে পরীক্ষার ফল বেরুলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের চাকরীটা পেয়ে গেল।

আর নয়, এবাড়ীতে আর নয়।

শ্রীমন্ত হ্যারিসন রোডের এই মেসটা ঠিক করলে। এবং একটা রবিবার হিমাংশুবাবুর অনুমতি নিয়ে, তাঁকে প্রণাম ক'রে চাকর-বাকরদের বখশিস দিয়ে মেসে চলে এল।

অপরিচিত আবহাওয়া।

এর পূর্বে জীবনে কখনও সে মেসে থাকেনি। এক ঘরে দুটো সীট। চাকর-ঠাকুর, লোকজন সকল সময়েই বারান্দা দিয়ে যাওয়া-আসা করছে এবং উন্মুক্ত দ্বারপথে তার দিকে একবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। 'গোপনীয়তার' বালাই নেই। মেসের জীবনযাত্রায় 'Privacy'র কোনো স্থান নেই। খাওয়া কদর্য এবং একঘেয়ে। আলু-পটোল-ঝিঙে-কুমড়ো-কাঁচকলা, মাছের ঝাল, মাছের ঝোল একটা আশ্চর্য কৌশলে সমস্ত কিছুর স্বাদ এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে। চোখ বন্ধ ক'রে খেলে কোনটা কি, কিছু বোঝবার উপায় নেই। যেন এক বহু হয়েছিল, আবার একে পরিণত হয়েছে।

বাড়ী যেমন নোংরা, তেমনি বিশৃঙ্খল।

কিন্তু শ্রীমন্ত দমলো না। সে জানে, জীবনের চলার পথে এসব এক একটি পান্থশালা মাত্র। জীবনের ইতিহাসে এর মূল্য হয়তো আছে। কিন্তু সে বেশি নয়।

কোথায় কোন অখ্যাত গ্রামে দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম, সে আজ আর তার ভালো ক'রে মনেই পড়ে না। ঘোষেদের প্রাসাদ,—তার

বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের প্রথমাংশ যেখানে কেটেছে,—সেও ভুলতে তার বেশি দেরি হবে না। এ তো তুচ্ছ মেস, হৃদয়ের বন্ধন যেখানে স্বভাবতঃই শিথিল!

শ্রীমন্তর মন মাঝে-মাঝে উদাস হয়ে যায়। কিন্তু তবু সে দমে না। নিজের প্রয়োজনে যে ক'টা দিন প্রয়োজন, এই মুসাফিরখানায় তাকে সেই ক'টা দিন চোখ-কান বুঁজে কাটিয়ে দিতেই হবে। এর মধ্যে দ্বিধার অবকাশ নেই, ক্ষোভ কিংবা দুঃখেরও কোনো কারণ নেই। অনেকটা 'রোগী যথা নিম খায় নয়ন মুদিয়া'!

এরই মধ্যে একটা সুবিধা শ্রীমন্তর হয়েছে।

তার ঘরে সীট যদিচ দুটো, কিন্তু এই চারদিনের মধ্যে আছে সে একাই। পাশের সীটটা খালি নয়, তা বোঝা যায়। তক্তাপোশের উপর বিছানাটা গুটোনো। তলায় একটা ট্রাঙ্কও আছে। কেবল লোক নেই। কে জানে তিনি কোথায় গেছেন।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একটি যুবক এসে উপস্থিত হ'ল। মাথার চুল রুক্ষ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনের কাপড় আধময়লা এবং গায়ে রূপোর বোতামবসানো একটা সাদা জিনের কোট। বিড়ি টানতে টানতে এসে শ্রীমন্তর দিকে অবাক হয়ে চাইলে।

—কাকে চান?—শ্রীমন্ত একটু বিরক্তভাবেই জিজ্ঞাসা করলে।

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যুবকটি গায়ের কোটটি খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রাখলে। বিছানাটি বেশ ক'রে ঝেড়েঝুড়ে পাতলে। হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে বিছানায় আরাম ক'রে ব'সে আর একটি বিড়ি ধরালে।

জিজ্ঞাসা ক'রলে, আপনিই বুঝি ওই সীটে নতুন এলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—বিস্মিত শ্রীমন্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলে।

—আমার নাম হরিশ ভদ্র। আপনার নামটি কি ?

—শ্রীমন্ত মিত্র।

—আপনার কুঁজোয় জল আছে ?

—আমার তো কুঁজো নেই।

—বলেন কি মশাই ? তেষ্টা পেলে করেন কি ?

—হুঁ। কিনতে হবে একটা।

হরিশ চীৎকার ক'রে বললে, ওরে কেষ্টো, কুঁজোয় একটু জল দিয়ে যাস তো। আর আসবার সময় এক গ্লাস জল নিয়েও আসবি অমনি। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল।

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছিলেন এ ক'দিন ?

—রাণাঘাটে।

—সেইখানেই বুঝি আপনার বাড়ী ?

বিরক্তভাবে হরিশ বললে, আজ্ঞে না মশাই। রাণাঘাটে আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনও যায়নি।

—তবে ? আপনি গেলেন কেন ?

চাকরী করতে। আর বলেন কেন মশাই, রেলের রিলীভিং চাকরী। যখন যেখানে লোক থাকে না, সেইখানে ছুটতে হয়। বাসা তো পাইনি, তাই থাকি-না-থাকি মেসের সীটটা রেখেছি। নইলে ক'দিনই বা থাকি এখানে ?

—এখন দু'দিন ছুটি তো ?

—ওই দুটো দিনই। পরশু আবার কোথায় ঠেলবে কে জানে। এনেছিস বাবা ? আঃ! ক'লকাতার কলের জল খেয়ে

বাঁচলাম! এইবার কুঁজোটা ধুয়ে একটু জল পুরে দাও। দিন দুই থাকতে হবে।

লোকটিকে শ্রীমন্তর খারাপ লাগলো না। ওরই সমবয়সী। দিনের প্রায় সমস্ত ক্ষণই তো অফিসে কাটবে। যেটুকু সময় মেসে থাকবে, দু'জনে গল্প ক'রে মন্দ কাটবে না,—এই ব'লে মনকে সে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলে।

অফিসেও শ্রীমন্তর দু'চারটি নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটেছে। সবাই তারই মতো সন্ত-পাশ করা যুবক; ট্রাউজারের উপর হাফশার্ট প'রে আসে। বেশ চটপটে, স্ফূর্তিবাজ ছোকরা। যে-কোনো স্বাধীন দেশে এরা মস্ত বড় মূলধন ব'লে বিবেচিত হ'তে পারতো।

কিন্তু কোথায় যেন কি গলদ ঘটেছে। এরা দেশের সেবা করে না, চাকরী করে শুধু। প্রথম-প্রথম এসে ওরা পলিটিক্স আলোচনা করতো বেশি। এখন কাজের চাপে তেমন সময় পায় না। তবু, শিক্ষিত ছেলের দল, বাইরের দু'চারটে বড় বড় কথা আলোচনা না ক'রে পারে না।

—খবর শুনেছ হে? এদিকে ইটালী গ্রীস আক্রমণ করলে, ওদিকে জাপান ত্রিশক্তি চুক্তিতে সই করলে। Very significant.

—কি হবে বলো দেখি

—জানিনে। কিন্তু দেখে নিও জার্মান সৈন্যদের বুলগেরিয়ায় ঢুকতে আর দেরি নেই।

—তারপরে?

—যুগোস্লাভিয়া। তারপরে তুরস্ক। ব্যস, ইউরোপ খতম। রইলো শুধু বৃটেন।

—তা যেন হ'ল। কিন্তু আফ্রিকায় ইটালী ওরকম হারছে কেন বলো তো

—পারছে না ব'লে। দেখছ না, সিদি বারানি, সোল্লুম, ফোর্ট কাপুৎসো, বার্দিয়া, বেনগাজী, এমন কি শেষ ঘাঁটি মোলাদিসর পর্যন্ত গেল? ওদের আছে কি?

—কেন, মুসোলিনী?

—হ্যাঁ। আর তার goose-step, কিন্তু তাতে লড়াই জেতা যায় না।

যুদ্ধের খবর সোমেশের কণ্ঠস্থ। ওদের সেক্‌শানে এ বিষয়ে ওকে অথরিটি বলা যেতে পারে।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিজনের উৎসাহ কম।

বললে, ও সব রেখে বলো দিকি জাপান কি করবে?

—যুদ্ধ। ঝড়ের মতো। দেখে নিও।

বিজন চিন্তিতভাবে বললে, ওকেই আমার ভয়।

( যেন এ যুদ্ধ তাকেই লড়তে হবে! )

—ভয় তো আছেই। দেখে নিও, ওদিক থেকে জার্মানি আর এদিকে থেকে জাপান সাঁড়াশির মতো এদিকে ছুটে আসবে।

—সর্বনাশ!

—ইংরেজ কি পারবে?

সোমেশ গম্ভীরভাবে বললে, মনে তো হয় না।

সবাই খুসি হয়ে উঠলো। জার্মানি তখনও রাশিয়াকে আক্রমণ করেনি। তখনও রাশিয়া জার্মানির মিত্র এবং ভারতবর্ষে বিভিন্ন কমিউনিষ্ট দলের মধ্যে রিক্তহস্ত আস্ফালন ক'রে 'জাপানকে রুখতে হবে' জিগীর ওঠেনি। প্রভুশক্তির পরাজয় সম্ভাবনায় পরাধীন জনসাধারণের

পক্ষে খুশি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই অনস্বাভাবিক খুশি সকলের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো।

শ্রীমন্ত এতক্ষণ নিঃশব্দে চা খাচ্ছিল।

এইবার মুখ তুলে বললে, তার মানে এই সিভিল সাপ্লাই আফিস আর থাকবে না। আমরা বেকার হব। সেটা ভেবেছ?

—তাতে কি, তাতে কি?—সবাই এক সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে উঠলো।

শ্রীমন্ত একটু মুচকে হাসলে।

বললে, কিচ্ছু নয়। শুধু "make hay while the sun shine ব্যস্।

টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাটা ঠক ক'রে নামিয়ে রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে শ্রীমন্ত উঠে দাঁড়ালো।

[ ৮ ]

১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে। ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত ১৫০০ মাইল ফ্রণ্টে বেধে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে জার্মান বাহিনী। সাত দিনের মধ্যে ব্রেষ্টলিটভস্ক, ভিল্‌না, কাউনাস এবং গ্রাদনোর পতন ঘটলো। পোনেরো দিনের মধ্যে সমগ্র বেসারেবিয়া জার্মানির করতলগত হ'ল। অক্টোবরের শেষে জার্মান বাহিনী মস্কোর মাত্র ৩৫ মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছুলো। স্ট্যালিন নিজে মস্কো রক্ষার ভার নিলেন।

এর মাসখানেক পরেই ৭ই ডিসেম্বর জাপান বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাওয়া গেল,

জাপানী বিমান আক্রমণে পার্ল্‌ হারবার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। দু'দিন পরেই আরও খবর পাওয়া গেল, উত্তর মালয়ের উপকূলে বৃটিশ ব্যাট্‌ল্‌শিপ 'প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স্‌' এবং ক্রুজার 'রিপাল্‌স' নিমজ্জিত।

বৃটেন এবং আমেরিকা এত বড় ধাক্কায় থমকে গেল। এত বড় আঘাতের জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না।

১২ই ডিসেম্বর তারিখে জার্মানি এবং ইটালীও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে এবং জার্মানি, জাপান ও ইটালীর মধ্যে একটা সামরিক চুক্তিও সম্পাদিত হ'ল।

খবর সাংঘাতিক। কিন্তু এই দুর্যোগেও দিগন্ত-কোলে একটি রূপালি রেখার সাক্ষাৎ মিললো: এতদিন পরে আমেরিকাকেও অবশেষে এক্সিসের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নামতে হ'ল। তার ধনবল, জনবল এবং সম্পদ অপরিমিত। অনেকে আশা করতে লাগলো, তার চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে এই যুদ্ধের মোড় ফিরলেও ফিরতে পারে।

কিন্তু সে কতটুকু আশা?

থাইল্যাণ্ড থেকে এগিয়ে আসছে জাপানী সৈন্য। ১৪ই ডিসেম্বর তারা দক্ষিণ বর্মায় ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে প্রবেশ করলে। আর বাঙ্গলা দেশে আরম্ভ হয়ে গেল একটা বিপর্যয় কাণ্ড।

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ক'লকাতা থেকে লোক পালাতে আরম্ভ করলো। শেয়ালদা আর হাওড়া স্টেশনে সকল সময় একটা জনসমুদ্রের কল্লোল উঠছে। কেউ টিকিট কিনতে পারছে, কেউ পারছে না। ঘুস চলছে বেপরোয়া। পুলিস, মিলিটারী আর রেলের কর্মচারীরা লাল হয়ে উঠলো। এক একদিনে তারা এক এক মাসের রোজগার করছে। যত ঘুস পাচ্ছে, তত লোভ যাচ্ছে বেড়ে। এবং আরও ঘুসের [illegible] যাত্রীদের উপর অত্যাচার আরও বাড়ছে।

৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে মালয়ের যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল।

ক'লকাতায় তখন স্ত্রীলোক ও শিশুর চিহ্ন নেই বললেই চলে। বহু বাড়ী খালি। স্কুল-কলেজ বন্ধ। যারা রয়েছে তাদের মুখে সকল সময় একটা আতঙ্কের ভাব। কখন কি হয়,বলা যায় না।

এদেশের সত্যকার অবস্থা কি, তা তারা জানে না। কিছুই তারা নিশ্চিত ক'রে বুঝতে পারছে না। আর যে যত বেশি বুঝতে পারছে না, সে তত বেশি ভয় পাচ্ছে। এ বাড়ীর ভয় পাশের বাড়ীতে সংক্রমিত হচ্ছে মহামারীর মতো। দেখতে দেখতে পাড়া শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

গুজব উঠছে নিত্য নতুন! তার বৈচিত্র্য কি!

যারা শোনে তাদের পীলে চমকে ওঠে। আবার একটা পালাবার হিড়িক পড়ে যায়।

অর্থের অভাবে, বাইরে উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে যারা রয়ে গেল, তাদের আর দুর্দশার অবধি রইলো না।

ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার রাত্রি। সন্ধ্যার পরেই গলি রাস্তা জনশূন্য হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে বসে থেকেও লোকের গা ছমছম করে। রাত্রে ঘুম হয় না ভালো ক'রে। কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠলে লোকে বিছানার উপর উঠে বসে। শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী গেল সিঙ্গাপুর।

আর আশা কোথায়? গবর্ণমেণ্ট পর্যন্ত কাগজ-পত্র সরাতে আরম্ভ করলেন। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর পর্যন্ত খালি হয়ে গেল। সিঙ্গাপুর ভারতের পূর্বদ্বার। সেই সিঙ্গাপুর গেলে আর রইলো কি?

আরও কিছু লোক ক'লকাতা ছেড়ে চলে গেল।

১০ই মার্চ গেল রেঙ্গুন।

ব্যস্!

হ্যারিসন রোডের মেসের অবস্থাও তথৈবচ।

ঠাকুর-চাকর দু'ই পালিয়েছে। দু'চারজন বাবুও চাকরী ছেড়ে পালিয়েছে দেশে। ক'দিন ওরা নিজেরাই রেঁধেছে, বাসন মেজেছে। সম্প্রতি দ্বিগুণ মাইনেতে একটা ঠাকুর আর একটা চাকর পাওয়া গেছে। কিন্তু তারাও কখন পালায় কে জানে! ওদের কাছে বাবুরা সব সময় জোড়হাতে থাকে।

হরিশের এখন তিলমাত্র অবসর নেই। কখন আসছে, কখন যাচ্ছে তার ঠিক নেই। মাথার চুল রুখু। দাড়ি কামবার সময় নেই। চোখ কোটরে বসে গেছে। তবু সর্বদাই যেন হাসিখুশি।

—খুব হাসিখুশি যে! ব্যাপার কি।—শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করে।

হরিশ হাসে, জবাব দেয় না। দেওয়ার আবশ্যকও নেই। দুই পকেট তার নোটে, আধুলিতে, সিকিতে, দুয়ানিতে ভর্তি।

—আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। চব্বিশ ঘণ্টাই ডিউটি?

হরিশ হেসে বললে, ডিউটি কি আর চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে মশাই? ব্যাপার কি জানেন? গেলেই দু'পয়সা পাওয়া যায়।

—ভালো, ভালো। কিন্তু মেসের কি করা যায় বলুন তো?

কেন?

—'লেসি' তো চলে যাচ্ছেন।

—কোথায়?

—শোনেননি? ওঁদের অফিস চললো লক্ষ্ণৌ।

—তাতে কি?

—বাড়ীর 'লীস' কার নামে নেওয়া যায়?

—আমার নামে নিন। কি আপনার নামে?

—আপনার আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি কি? থাকতে তো হবে।

'লেসী'র ঝামেলা অনেক। বিশেষতঃ এই দুর্যোগের মধ্যে। কিন্তু হাতে দু'পয়সা আসছে ব'লে হরিশ এখন সে ঝামেলা গ্রাহ্যই করে না। তার জন্যে ভয়ও পায় না।

তার নামেই নতুন 'লীস' নেওয়া হ'ল। বহু বাড়ী খালি। সুতরাং একটু চেষ্টা করতেই বাড়ীভাড়াও বেশ কিছু কমলো।

কয়েকজন নতুন মেম্বারও এলো। একটু বয়স্ক। ওঁরা জাপানী বোমার ভয়ে স্ত্রীপুত্র দেশে পাঠিয়ে দিয়ে মেসে আশ্রয় নিয়েছেন। একটু আয়েশী লোক। মেসে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু কি করবেন? উপায় তো নেই। বিশেষ সকলেরই বিশ্বাস আর ক'টা দিন মাত্র! তারপরে সবাইকেই তো ক'লকাতা ছাড়তে হবে। মেসের দুঃসহ জীবনে সেই-টুকুই একমাত্র সান্ত্বনা।

ইতিমধ্যে দলে দলে আসতে লাগলো লোক। রেঙ্গুণ থেকে 'ব্ল্যাক রুট' দিয়ে পায়ে হেঁটে এরা আসাম সীমান্তে পৌঁছোয়। সেখান থেকে ট্রেণে ক'লকাতায়।

সর্বহারার দল!

এদের অনেকেই একদিন ভাগ্যান্বেষণে রিক্তহস্তে বাঙলা দেশ ছেড়েছিল। সেখানে বিবিধ প্রকারে যথেষ্ট অর্থও করেছিল। ভাগ্যের চক্রান্তে সমস্ত সম্পদ বর্মাতেই ফেলে রেখে আবার রিক্ত হস্তেই দেশে ফিরলো।

কী চেহারা!

দেখলে মনে হয়, যেন চিতা থেকে এইমাত্র উঠে এল। চোখমুখ ঝল্‌সে গেছে।

শ্রীমন্ত ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। কি যেন ভাবে। কি ভাবে, সেই জানে।

দেখতে দেখতে সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের আশ্চর্য শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। নবাগত তরুণ-তরুণী কেরাণীতে ফুলে ফেঁপে উঠলো। রঙ বেরঙের শাড়ীতে আর রকম-বেরকমের স্যুটে আফিস সরগরম।

কাজও হু হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার চাপ এসে পড়েছে মুষ্টিমেয় জনকয়েক কেরাণীর উপর। বাকি অধিকাংশই যেন বরযাত্রী এসেছে, এমনিভাবে হালকা হাওয়ায় প্রজাপতির মতো ভেসে বেড়ায়।

শ্রীমন্তের মুরুব্বির জোর আছে। কিন্তু সে জানে মুরুব্বির জোরে চাকরী রাখা যেতে পারে, কিন্তু উপরে উঠতে গেলে ফাঁকির কারবার চলবে না। কাজ শিখতে হবে এবং তার জন্যে খাটতে হবে।

সে অটুট স্বাস্থ্য পেয়েছে। খাটতে ভয় পায় না। খাটেও প্রচুর। আর যে খাটে, স্বাভাবিকভাবেই তার টেবিলে ফাইলও জমে প্রচুর। সেই স্তূপ ঠেলতে অধিকাংশ দিনই তার সন্ধ্যা উৎরে যায়। তার জন্যে সে বিরক্ত হয় না। যতক্ষণ অফিসে থাকে ততক্ষণ অবিশ্রান্ত খাটে। ফাইল থেকে মুখ তোলবার সময় পায় না।

বৃদ্ধ বড়বাবু এর জন্যে তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

কিন্তু এতাবৎ তাঁর সেই স্নেহ ফাইলের পর ফাইল পাঠানোর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। যত কঠিন এবং জটিল ফাইল তার কাছে পাঠিয়ে তিনি বাধিত করতেন। সোমেশ-বিজনের দল তার জন্যে তাকে বিদ্রূপও কম করতো না। শ্রীমন্ত তাদের কথায় উত্তর দিত না। নিঃশব্দে একটু হেসে সমস্ত বিদ্রূপ শিরোধার্য ক'রে নিত।

ও শুধু অপেক্ষা করছিল।

কিসের জন্যে? সে ও নিজেও জানতো না। বোধ করি ওর ভবিতব্যের জন্যে,—নিঃশব্দে এবং পরম শ্রদ্ধা ও গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে।

দিন যায়, মাস যায়। খাটুনির উপর খাটুনি বাড়ে। সে তবু

নিঃশব্দে প্রতীক্ষা ক'রে চলে। কোনো ব্যর্থতায় ওর বিশ্বাস এতটুকু শিথিল হয় না।

ভবিতব্য? কি ওর ভবিতব্য?

কেউ জানে না। ও নিজেও না। ও কেবল স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নে বিশ্বাস করে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বড়বাবু ওর টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মাথা নিচু ক'রে একমনে ও কাজ ক'রে যাচ্ছিল। বড়বাবুর আসা টের পায়নি।

—শ্রীমন্ত!

জোরে নয়, আস্তেই বড়বাবু ডাকলেন।

—Yes, Sir!

শ্রীমন্ত সোজা উঠে দাঁড়ালো।

—যাবার সময় আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবে।

—আমার যেতে সাতটা বেজে যায় স্যার। আপনি কি তখন পর্যন্ত থাকবেন?

—থাকব।

বড়বাবু মশমশ ক'রে নিজের টেবিলে ফিরে গেলেন।

শ্রীমন্ত অন্যমনস্কের মতো ওর দিকে চেয়ে রইলো:

গলাবন্ধ তসরেটের একটা কোট, ভাঁজহীন একটা ট্রাউজার, পায়ে বার্নিশ অভাবে মলিন একজোড়া দামী জুতো। কশের ফাঁকে একটা পান, তার জন্যে একদিকের গাল ফোলা। দাঁত অনেকগুলিই প'ড়ে গেছে। যে ক'টা আছে তাও পানের ছোপে পাকা তরমুজের বীচির মতো কালো।

বৃদ্ধ মানুষ!

মাথার ছোট-ছোট-করে-ছাঁটা চুলগুলি সব পেকে বিরল হয়ে এসেছে। এক প্রস্থ পুরাপুরি চাকুরি সেরে অবসর নিয়ে এই অফিসে এসেছেন বাণপ্রস্থ উপভোগ করতে।

ওঁকে দেখে শ্রীমন্তর করুণা হয়।

কেন যে ডেকেছেন কে জানে! কাজ সেরে ও যখন বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন অফিসে বড়বাবুর খাস বেয়ারা ছাড়া আর কেউ বড় নেই।

গোপনে দুজনে অনেক্ষণ অনেক কথা হ'ল।

কী যে কথা তা কেউ জানলে না।

অফিস তখন খালি।

বেয়ারাটা দূরে একটা টুলের উপর বসে ঝিমুচ্ছে।

[ ৯ ]

বঞ্চনা নীতি!

মে মাসের ৮ তারিখে বাঙলায় জাপবিমানের প্রথম আক্রমণ হ'ল চট্টগ্রামে। বৃটিশ সৈন্য তখন অত্যন্ত দ্রুতবেগে বাঙলায় পিছিয়ে আসছে। মে মাস যখন শেষ হ'ল তখন বর্মায় একটিও বৃটিশ সৈন্য আর রইল না,—সমরবন্দী ছাড়া।

বাঙলায় তখন অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে নৌকো পোড়ানো এবং সাইকেল আটক চলেছে। যে-কোনো সময় জাপানী-বাহিনী পূর্ব ভারতে প্রবেশ করতে পারে। তখন যাতে তারা স্থানীয় নৌকা কিংবা সাইকেল ব্যবহারের সুবিধা না পায়, তার জন্যেই এই সতর্কতা।

শুধু যানবাহন নয়, খাদ্যের সম্বন্ধেও সতর্কতার অন্ত নেই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব চা'লও পূর্ব বাঙলা থেকে সরানো হ'ল, ফলাফল চিন্তা না ক'রে।

ক'লকাতায় তখন একটা থমথমে ভাব।

এমন সময় একদিন উত্তর ক'লকাতার একটা সিনেমা হলে শ্রীমন্ত আর সুমিত্রা রায়কে দেখা গেল।

সুমিত্রা সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ স্মার্ট। তার একটা জলুস আছে। সেই জলুসে ওকে সুন্দরীই দেখায়। শ্রীমন্তদের অফিসে ওর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তরুণদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অথচ এত লোক থাকতে আলাপ হ'ল ওর শ্রীমন্তের সঙ্গে,—অফিসে যার মাথা তোলবার সময় নেই, গল্পগুজবের অবকাশ নিতান্তই কম।

সেও এক আশ্চর্যভাবে। এই সিনেমা হলে।

শ্রীমন্ত বসে সিনেমা দেখছিল একটা রবিবারে সন্ধ্যায়। মাঝখানে বিরামের সময় হঠাৎ দেখলে সামনের সীটে সুমিত্রা !

সুমিত্রাও মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখে চমকে গেল !

—একি, আপনি ?

শ্রীমন্ত হেসে নমস্কার করলে।

—আমার ধারণা ছিল আপনি কোথাও বেরোন না।

—তবে আমি কি করি ব'লে আপনার ধারণা ?

—শুধু ফাইল ঘাঁটেন আর নোট লেখেন।—সুমিত্রা কলকণ্ঠে হেসে উঠলো।

—রবিবারেও ?

—সব বারেই।

খুব চটপটে মেয়েটি তো! শ্রীমন্তর মন উসখুস করে, চোখে আবার সেই পুরোনো নেশা ঘুমায়।

—কাল অফিসে যাচ্ছেন তো?—সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে।

—কাল তো ছুটি। জানেন না আপনি?

—জানি। আমার ধারণা ছিল, পর পর দু'দিন ছুটি আপনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। বাধ্য হয়ে অফিস যাবেন।

—ব্যাপার সেই রকমই। সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত দিন একলা হোটেলের ঘরে কাটানোর চেয়ে শাস্তি আর নেই। তার চেয়ে অফিস ভালো।

—আপনি হোটেলে থাকেন বুঝি? কোথায়?

—হোটেল লাক্সুরিয়াস। কাছেই।

—I see.

ঘণ্টা বেজে গেল। একে একে হলের আলো নিভতে আরম্ভ করলে। কিছু পরে আবার সিনেমা আরম্ভ হ'ল।

কিন্তু শ্রীমন্তের আর সিনেমা দেখতে মন বসে না। তার দুই চোখ জ্বালা করছে।

সিনেমার শেষে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগলো?

—মন্দ নয়।

—কিন্তু গল্পটা যেন ঠিক দানা বাঁধেনি। না?

সিনেমা-ভাঙা জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মন্থরগতিতে ওরা দুজনে পাশাপাশি চলছে।

হঠাৎ চুপি-চুপি সুমিত্রা বললে, জাপানীরা হোমালিনে এসে গেছে, শুনেছেন?

—হোমালিন? সে কোথায়?

—ইস্কুল থেকে ৬৫ মাইল দূরে। Only sixty-five miles.

—কাছেই তাহ'লে?—উত্তেজনায় কথাটা শ্রীমন্তের মুখ দিয়ে জোরেই বেরিয়ে গেল।

—চুপ।

সুমিত্রা সাবধান ক'রে দিলে। এই ভিড়ের মধ্যে ও সম্বন্ধে এত জোরে কথা কওয়া নিরাপদ নয়। এত লোকের মধ্যে কে কি, কেউ জানে?

ওরা সিনেমা গৃহের ফটকে এসে দাঁড়ালো।

—আপনার সঙ্গে কেউ নেই?—এতক্ষণ পরে এ প্রশ্ন শ্রীমন্তের মাথায় এলো।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি পিছনে চেয়ে বললে, এই যে! আমার বোন মঞ্জরী রয়েছে। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ও বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে।

ওরা পরস্পর নমস্কার বিনিময় করলে।

—কী ভিড় দেখছেন? ট্রামে বাসে ওঠাই মুশকিল।

ট্রাম-বাসের দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত বললে, সিনেমা-ভাঙার সময় কি না। আপনি কি দূরে থাকে?

—খুব দূরে নয়।—অন্যমনস্কভাবে সুমিত্রা উত্তর দিলে।

ওর গা ঘেঁষে দাড়িয়ে মঞ্জরী বললে, হেঁটেই চলো না দিদি। চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। বেশ লাগবে এটুকু আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে।

—সেই ভালো।—সুমিত্রা সম্মতি দিলে।

তারপর শ্রীমন্তর দিকে ফিরে নমস্কার ক'রে বললে, আচ্ছা আসি তাহ'লে। কাল কের অফিসে দেখা হবে।

শ্রীমন্ত ঘাড় বেঁকিয়ে নমস্কার ক'রে হেসে বললে, এবার আপনি ভুল করলেন। কাল ছুটি।

হাসতে হাসতে ওরা একদিকে চ'লে গেল, শ্রীমন্ত আর একদিকে।

হোটেলে ফিরে জামা খুলতে খুলতে শ্রীমন্তর মনে পড়ল: জাপানীরা হোমালিনে এসে গেছে, ইম্ফল থেকে ৬৫ মাইল দূরে—Only sixty-five miles…… সুমিত্রার সেই রহস্যঘন চাপা কণ্ঠস্বর!

দিন কয়েকের মধ্যেই ওদের দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল,— শ্রীমন্ত আর সুমিত্রার মধ্যে।

চমৎকার মেয়ে এই সুমিত্রা। শ্রীমন্তর এত ভালো লেগেছে যে, বলবার নয়। রং শ্যামবর্ণ। কিন্তু এই অফিসে আরও তো কত মেয়ে চাকরী করে, তার মধ্যে এমন স্বাস্থ্য কার? চোখে-মুখে, ঘোরা-ফেরায় সেই পরিপূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্যের আনন্দ যেন উছলে পড়ছে। বি-এ পাসের পাণ্ডুর চিহ্ন সকলের উপর সুস্পষ্ট, কেবল এই মেয়েটি বাদে। পরীক্ষা-পাসের পড়া কেবল একেই জব্দ করতে পারেনি। স্বচ্ছন্দ বনলতার মতো পরিপুষ্ট শ্যামশ্রী একেই কেবল ত্যাগ করেনি।

সুমিত্রাও ঠিক এই কথাই ভাবে:

শ্রীমন্তের স্বাস্থ্য একটা দেখবার মতো জিনিস। লোহার মতো শক্ত দেহে বাজে চর্বির বালাই নেই। কিন্তু ওই দীর্ঘচ্ছন্দ ঋজু দেহে যে প্রচুর শক্তি সংহত হয়ে রয়েছে, ওর মসৃণ প্রশস্ত ললাট, ঋজু নাসিকা, ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ এবং পুরু ঠোঁটের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়।

হৈমন্তীর মতো সুমিত্রাকেও এই শক্তিই বুঝি দুরন্তবেগে আকর্ষণ করেছে। তারই জন্যে সমস্ত কাজ ফেলে অফিসের ছুটির পর সুমিত্রা বেঁটে ছাতাটি বগলে ক'রে এসপ্লানেডের মোড়ে শ্রীমন্তের জন্যে অপেক্ষা করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

শ্রীমন্তের কাজ আর শেষ হয় না।

বাইরে ক্ষান্ত-বর্ষণ শেষ অপরাহ্নের মেঘ রঙে-রঙে মনোহর হয়ে উঠেছে। গাছের জলে-ধোয়া চিকণ পাতায় লেগেছে রঙের নাচন। মাঠের কচি ঘাসে পড়েছে নবীন মেঘের ছায়া।

শ্রীমন্ত জানে, সুমিত্রা এমনি সময় এস্‌প্লানেডে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে সেই ছয়টা থেকে। তার কচি পাতার মতো লাবণ্যমণ্ডিত মুখে এসে পড়েছে অস্তমেঘের আভা। ছটফট করছে সে।

তবু শ্রীমন্তের কাজ আর শেষ হয় না।

মাথা তোলবার তার অবসর নেই। টেবিলের উপর তখনও অনেক ফাইল। কাজ ফেলে রেখে যাওয়া সে পছন্দ করে না। যখন টেবিলে আর একখানাও ফাইল থাকবে না, তখন সে উঠবে। বাথরুম থেকে বেশ ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে আসবে। তারপর কোটটি গায়ে দিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে একবার নিরিবিলি দেখা ক'রে আসবে।

কিছুদিন থেকেই বড়বাবুর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। নিরিবিলি অনেকক্ষণ আলোচনার পরে দু'জনেই অফিস থেকে বেরুবে।

তারপর বড়বাবুকে সেই ভিড়ের মধ্যে বহু ক্লেশে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে এস্‌প্লানেডের দিকে ফিরবে।

রাস্তায় তখন ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু শ্রীমন্তর কিছু ভুল হয় না। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সুমিত্রার গায়ে হাত দিতেই সুমিত্রা প্রথমটা চমকে ওঠে। তারপর কলকণ্ঠে অনর্গল বকতে আরম্ভ করে। তার মধ্যে কিছু রাগের, কিছু অনুরাগের!

বলে: Brute! ভদ্রমহিলাকে এমনি ক'রে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে লজ্জা করে না তোমার?

শ্রীমন্ত হাসে। সাপের জিভের মতো লিকলিকে হাসি। অন্ধকারে সুমিত্রা তা দেখতে পায় না।

শান্ত কণ্ঠে শ্রীমন্ত বলে, Excuse me! আর কেনোদিন দেরি হবে না।

রোজই এই কথা বলে; রোজই দেরি হয়।

সেখান থেকে ওরা যায় হোটেল ডি-রিওতে। তারপরে ন'টার শো'তে সিনেমায়। রাত বারোটায় একটা ট্যাক্সি ক'রে ওকে পৌঁছে দেয়।

সুমিত্রার পিছনে কী খরচটাই না করে শ্রীমন্ত! কে জানে, অত টাকা সে কোথায় পায়? সব কাজেই সে যেন জলের মতো টাকা খরচ করে! দেখে ওর সম্বন্ধে সুমিত্রার সম্ভ্রম জাগে।

[ ১০ ]

হ্যারিসন রোডের মেস। সেখান থেকে অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল হোটেল। তারপরে সুন্দর একটি ফ্ল্যাট। এই একটা বৎসরে শ্রীমন্ত ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে।

ধর্মতলার উপরেই এই ফ্ল্যাট। চারতলায় দু'খানি প্রশস্ত ঘর। সামনের ঘরখানি, বসবার ঘর। এই দুর্মূল্যের বাজারেও তা মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো। পাশেরটি শোবার ঘর। সেটিও সুসজ্জিত। একটি চাকর রেখেছে। সে-ই রান্নাও করে।

অফিস থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে ওরা হোটেল ডি-রিওতে এখনও যায়। কিন্তু বেশির ভাগ সন্ধ্যায় ওদের এই ঘরেই মজলিস বসে।

শীতের সন্ধ্যা।

নিভৃত গৃহকোণে একটি সোফায় একখানি 'রাগ' কোলের উপর রেখে দু'জনে সন্ধ্যা-যাপন কি মনোরম! সিগারেটের ধোঁয়া ওঠে স্বপ্নের মতো।

সেদিন সন্ধ্যায় একটু বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

ওরই মধ্যে ঘরখানিকে একটু বিশেষভাবে সাজানোও হয়েছে। উপরে রান্নাঘরে রকমারি রান্নাও হচ্ছে।

সুমিত্রা ঘরে পা দিয়েই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

ওকে সযত্নে একটি সোফায় বসিয়ে শ্রীমন্ত বললে, আছে ব্যাপার।

সুমিত্রাকে ওইখানে বসাবার জন্য আগে থেকেই যেন ব্যবস্থা করা আছে। ও বসতেই ঢাকা-আলোর ফাঁক দিয়ে সমস্ত আলো ওরই মুখের উপর, ওর পরনের হালকা নীলশাড়ীর জরিদার পাড়ের উপর ঝলমলিয়ে উঠলো।

ওর পায়ের তলার লাল কার্পেটখানা আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে যেন অবগুণ্ঠনের মধ্যে হাসতে লাগলো। রেডিও সেটটা বাজছে। ওরা দুজনে থাকিলে রেডিও বড় একটা বাজে না।

সুমিত্রা সন্দিগ্ধভাবে আবার বললে, কি ব্যাপার বলো তো?

হেসে শ্রীমন্ত বললে, একটু পরেই বুঝতে পারবে।

—তবু?

শ্রীমন্তকে উত্তর দিতে হ'ল না, স্বয়ং বড়বাবু এসে দাঁড়ালেন ঘরের একেবারে মাঝখানে।

আধো-অন্ধকারে লোকটিকে প্রথম দৃষ্টিতে সুমিত্রা চিনতে পারলে না। সেই গলাবন্ধ তসরেটের কোট নেই, পেণ্টলুন নেই, সেই ভারি শূ-জুতোও না। তার বদলে মূল্যবান শান্তিপুরী ধুতি, গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি, জরিপাড় সূক্ষ্ম চাদর এবং পায়ে সোয়েডের নিউ-কাট জুতো।

গা দিয়ে ভুর ভুর ক'রে এসেন্সের উগ্র গন্ধ বা'র হচ্ছে।

প্রথম দৃষ্টিতে সুমিত্রা কেন, সকলেরই চেনা মুস্কিল।

শ্রীমন্ত 'আসুন, আসুন' ব'লে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। সেই সঙ্গে সুমিত্রাও।

কর্কশ কণ্ঠ যথাসাধ্য মোলায়েম ক'রে বড়বাবু উত্তরে বললেন, এই যে! কি ব্যাপার বলো তো? হঠাৎ আমার মত অরসিককে আহ্বান!

—কিছু না, এমনিতেই আমার ঘরে একটু আপনার পায়ের ধূলো চাইলাম।

শ্রীমন্ত এমন সমাদরে ওঁকে সুমিত্রার পাশের কুশ্যনটায় বসালে যেন স্বয়ং গভর্ণর এসেছেন ওর ঘরে।

অভ্যাসবশে সুমিত্রাপর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো। অফিসে এই ব্যক্তিটি সামান্ত তো নন, গভর্ণরেরই সামিল। 'মারিলে মারিতে পারে, রাখিতে কে করে মানা!' তাঁর ওই কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং ততোধিক কর্কশ বাক্য অনেকেরই হৃৎকম্প সৃষ্টি করে।

সোনালী-তবক-মোড়া পান এলো, দামী সিগারেটের টিন এবং উৎকৃষ্ট জর্দা এলো। চাকরটা একটা অ্যাশ্-ট্রে এনেও রেখে গেল।

দেখতে দেখতে বড়বাবু সম্বন্ধে সুমিত্রার ধারণা গেল বদলে। তাঁকে যতখানি ভয়াবহ এবং নীরস ব্যক্তি ব'লে তার ধারণা ছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। দেখা গেল, বৃদ্ধ হলেও ভদ্রলোক অতি সুরসিক ব্যক্তি। নিজের হাতে ওকে তিনি সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

হাত জোড় ক'রে সুমিত্রা অসম্মতি জানালে। কিন্তু বড়বাবুর অমায়িক ব্যবহারে সে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে, নিজে দেশলাই জেলে ওঁর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলে। দু'জনের মুখ কাছাকাছি আসতেই ভক্ ক'রে তার নাকে যেন মদের গন্ধ এলো।

কাঠিটা নিবিয়ে ট্রের মধ্যে ফেলে এদিকে চাইতেই দেখলে, শ্রীমন্ত দিব্যি একটা সিগারেট ধরিয়ে বড়বাবুর সামনে টানছে।

বড়বাবুর সামনে সিগারেট !

বিস্ময়ে তার চোখ-মুখের এমনই অবস্থা হ'ল যে, তা বড়বাবুর ক্ষীণ দৃষ্টিও এড়ালো না।

জবাফুলের মতো লাল চোখ ঢুলঢুল ক'রে বললেন, **Never mind, Miss Roy. We are friends here,—we are all friends here.** এটা অফিস নয়। এখানে সব বন্ধু আমরা।

ব'লে ভদ্রলোক এমন জোরে হেসে উঠলেন যে, সুমিত্রা চমকে উঠলো।

পরের দিন সুমিত্রা অফিসে এলো না। লিখে পাঠিয়েছে তার মাথা ধরেছে জ্বরের মতো হয়েছে।

শ্রীমন্ত অফিসের শেষে বড়বাবুর কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বললে, **You perhaps drove too rashly, Sir.**

বাঁ হাতে খানিকটা হাওয়া যেন ঢেউ দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বড়বাবু বললেন, **Don't you worry.** সব ঠিক হো যায়েগা। শোনো। একটা ভালো চাকরী খালি হচ্ছে। পরেশ চলে যাচ্ছে দিল্লীতে। তার জায়গায় আমি তোমার নাম সুপারিশ করেছি। সাহেব রাজি হয়েছেন।

আহ্লাদে গদগদ হয়ে শ্রীমন্ত বড়বাবুর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। তখন তার দেহ যেন তুলোর মত হালকা হয়ে গেছে।

এই চাকরীটার মানে মাসে তিনশো পঁচাত্তর টাকা !

আর এক ধাপ, তার পরেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট !

বাসায় ফিরে সে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলে। শোবার ঘরে এসে গুন্ গুন্ ক'রে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যখন সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মাথা আঁচড়াচ্ছে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সুমিত্রা এসে ওর খাটের এক প্রান্তে বসলো।

নিঃশব্দে।

শ্রীমন্ত টেরই পেত না, যদি না আয়নায় ওর ছবি পড়তো।

পিছন ফিরেই সে চমকে উঠলো :

সুমিত্রা !

সুমিত্রা সাড়া দিলে না। নীরবে চোখ মেলে চাইলে।

এই ঘরটিতে আলোটা এমন জায়গায় বসানো যে, জানালা খোলা থাকলেও বাইরে আলো পড়ে না। সেজন্যে এ-ঘরের আলোয় আর কাগজের ঘেরাটোপ দেবার আবশ্যক হয়নি।

সেই পরিপূর্ণ আলোয় শ্রীমন্ত দেখলে, সর্বস্ব হারালে মানুষের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, সেই বিভ্রান্ত ব্যাকুল দৃষ্টি সুমিত্রার চোখে !

শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে ওর পাশে ব'সে ওর পিঠের উপর একখানি হাত রাখলে। মিনিট কয়েক তার মুখে একটাও সান্ত্বনার কথা বা'র হ'ল না।

একটু পরে বললে, বিশ্বাস কর সুমিত্রা, আমি নিজেও এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

সুমিত্রা ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে।

তারপর বললে, আমাকে তুমি কচি খুকী পেয়েছ, না? তাই বোঝাতে চাইছ, তুমি কিছু জানতে না?

শ্রীমন্ত অভিনয় মন্দ করে না।

কাতরস্বরে বললে, আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরো না সুমিত্রা।

তীব্রকণ্ঠে সুমিত্রা বললে, তাহ'লে তুমি বড়বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলে কেন?

—এমনি। একটু তোয়াজ করবার জন্যে। বুঝতেই তো পারছ।

বুঝতে সবই পারছি। তুমি জানতে সন্ধ্যের পর আমি আসব। তার পরেও বড়বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলে। খাবার আয়োজনও করেছিলে তিন জনের জন্যে। বড়বাবু এলেন মত্ত অবস্থায়। বললেন, We are all friends here! তার পরেও বলতে চাও, এর পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না?

প্রতিবাদে শ্রীমন্ত কি একটা বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে সুমিত্রা বললে, বড়বাবুকে তোয়াজ করবার জন্যে? আমি শুধু এই কথাটা জানতে এসেছি, বড়বাবুকে তোয়াজ করবার জন্যে কতদূর যেতে পারো তুমি? শেষ পর্যন্ত?

শ্রীমন্ত রাগ করলে না। বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ব'সে শান্তকণ্ঠে বললে, রাগ কোরো না সুমিত্রা। রাগ করবার কী আছে এতে? কী এমন হয়েছে?

অবাক হয়ে সুমিত্রা ওর দিকে চাইলে:

—তুমি বলছ কি?

খুব বিজ্ঞের মতো শ্রীমন্ত হাসলে।

বললে, এমন কিছু হয়নি। একটা গলিতনখদন্ত কামার্ত বৃদ্ধ....

আকাশে দুই হাত তুলে সুমিত্রা বললে, থামো, থামো, থামো। ঘেন্নায় আমার সমস্ত শরীর পাক দিয়ে উঠছে!

—তবে?

শ্রীমন্ত হো হো ক'রে উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলো:

—তাহ'লেই বোঝ, রাগের কিছু নেই। ব্যাপারটা ঘেন্নার। তবু লোকটির সম্পূর্ণ পরিচয় তুমি জানো না। যে লোকটি কাল স্বচ্ছন্দে তোমাকে সিগারেট এগিয়ে দিয়েছিল, বাড়ীতে সেই লোকটিরই রূপ আলাদা। গৃহিণীর ছাদে যাবারও হুকুম নেই। রাস্তার দিকের জানালা কাঠ দিয়ে পেরেক মেরে বন্ধ করে দিয়েছে। পাছে তার গৃহিণী তার অনুপস্থিতিতে জানালায় এসে দাঁড়ায় এবং বাইরের কেউ দেখে ফেলে।

—বলো কি?

সুমিত্রা সব ভুলে অবাক হয়ে বললে।

—তাই অফিসে বেরুবার আগে স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ ক'রে রেখে দেয়, বড় বড় ছেলেমেয়ের সামনে।

—যাঃ!—সুমিত্রা হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

—সত্যি কথা।

ওকে হাসতে দেখে শ্রীমন্তর সাহস বেড়ে গেল।

বললে, স্বার্থের খাতিরে এই লোককে যদি একটু নাচানো যায়, কী এমন দোষ?

—এর জন্যে তুমি আমাকে পর্যন্ত ব্যবহার করবে?

অম্লান বদনে শ্রীমন্ত বললে, যদি তুমি রাজি হও।

মুহূর্তের জন্যে সুমিত্রা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হো হো ক'রে হেসে বললে, তুমি একটা Villain। তবু আশ্চর্য তুমি! সকালে উঠে ভেবেছিলাম, জীবনে বুঝি তোমার কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। ভালোই হ'ল এলাম। তোমায় চিনলাম, তোমার বড়বাবুকেও চিনলাম। মনটা হালকা হ'ল। ব্যাপারটা সত্যিই রাগের নয়।

সুমিত্রা হাসলে।

বললে, একটু চা খাওয়াবে?

সুমিত্রার কথাগুলি কেমন যেন বাঁকা বাঁকা। একবার শ্রীমন্ত একটু দ্বিধা করলে। তারপর বললে, চলো না, হোটেল ডি-রিও ?

—হো-টে-ল-ডি-রি-ও? চলো।

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে নিলে। মানি-ব্যাগটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালো।

বললে, চলো।

অন্যমনস্কের মতো সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালো। শ্রীমন্ত বুঝলে, মুখে যাই বলুক, কালকের ধাক্কা সুমিত্রা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

হোটেলের একটি কোণে একখানা নিরিবিলি টেবিলে ওরা দুজন বসলো।

চারিদিকে যেন তরুণ-তরুণীর মেলা ব'সে গেছে। যেন অসংখ্য প্রজাপতি গুচ্ছে-গুচ্ছে ফুলে-ফুলে ব'সে গেছে। তারই এক কোণে ওরা দুজনে বসলো।

শ্রীমন্ত খাবারের ফরমাস দিয়ে অপাঙ্গে সুমিত্রার দিকে চাইলে। মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, রাগ পড়লো?

কৃত্রিম কোপে ভ্রূভঙ্গি ক'রে সুমিত্রা শুধু বললে, Brute!

এই জায়গাটার একটা বিশেষ গুণ আছে। এই আলো-ঝলমল প্রশস্ত সুসজ্জিত হল, এই গুচ্ছ-গুচ্ছ প্রজাপতির সুসংযত ভিড়, খাদ্য ও পানীয়, সমস্ত মিলে মানুষের মনকে যেন সমাজ, স্বদেশ ও সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনে। তাকে শুধু হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কামার্ত বৃদ্ধের আচরণে যে গ্লানি সকাল থেকে সুমিত্রার দেহ ও মনকে পীড়িত করছিলো, তার কিছুটা গিয়েছিল শ্রীমন্তের ঘরে; অবশিষ্ট এই সুন্দর হলে প্রবেশ করামাত্র নিঃশেষ হয়ে গেল।

সুমিত্রার মন আবার আগের মতো হালকা হয়ে গেল। শ্রীমন্তের দিকে চেয়ে সে অকারণে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত বললে, তোমাকে একটা সুখবর দিই শোনো।

সুমিত্রা উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

—পরেশ হালদারকে তুমি চেনো ?

—কে পরেশ হালদার ?

—আমাদের অফিসে চাকরি করে। Permanent staff। দিল্লীতে বদলী হয়ে যাচ্ছে।

—তারপরে ?

একটু থেমে মুচকি হেসে শ্রীমন্ত বললে, তার জায়গায় আমি যাচ্ছি।

—বলো কি ? তুমি তো এখনও temporary !

—Permanent হয়ে যাব। সঙ্গে সঙ্গে তিন শো পঁচাত্তর টাকা মাইনে।

সুমিত্রা ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলে। তারপর চায়ে একটু চুমুক দিয়ে হেসে বললে, এর মূল্য দিতে হ'ল আমাকে তো ?

—হুঁ। তুমি করুণাময়ী, তোমার জয় হোক।

শ্রীমন্ত হাসলে।

Good evening, Miss Roy.

দুজনেই চমকে উঠলো। একটি শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ওদের টেবিলে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুমিত্রা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো :

Good evening, Capt. Alexander ! তুমি এখানে ? ভারি খুশি হ'লাম। দাঁড়াও তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ বোস, ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার of the American Army.

ওরা পরস্পরের করমর্দন করলে।

সুমিত্রা ওকে চায়ে আহ্বান করলে। মার্কিন ভদ্রলোকটি বড় অমায়িক লোক, তখনই রাজি হয়ে গেলেন।

শ্রীমন্তর দ্বিধা ঘোচেনি। সন্দিগ্ধভাবে ওর দিকে চাইতে লাগলো। তবু বিদেশী অতিথি। চুপ ক'রে থাকা ভদ্রতা নয়।

জিজ্ঞেস করলে, কেমন লাগছে এ দেশ?

—Splendid! আশ্চর্য তোমাদের এই দেশ! আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিল নেই, আচারে-ব্যবহারে। বাইরে থেকে যারা তোমাদের দেখবে, তাদের অদ্ভুত লাগবে। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো, আমি তোমাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। তোমাদের যত দেখছি....

সুমিত্রা বাধা দিলে। হাসতে হাসতে বললে, থামো, থামো। তারপর দেশে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বই লিখবে তো? তোমাদের আমরা চিনেছি।

আলেকজাণ্ডার গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, সে অপরাধ আমি স্বীকার করি, মিস রায়। আমার লজ্জা হচ্ছে, আমি সেই সব অভিযোগ বিশ্বাস করেছিলাম।

শ্রীমন্ত বললে, কেন, এখন বিশ্বাস কর না? আমি তো দেখছি, তার অনেক অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয়।

—না। —আলেকজাণ্ডার উৎসাহিত হয়ে উঠলো,—সেইটেই আরও অনিষ্টকর। আধখানা সত্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই।

চায়ে চুমুক দিয়ে আলেকজাণ্ডার বললে, আসল কথা কি জানো, আচার-অনুষ্ঠানটা বাইরের জিনিস। তার পেছনের যে ফিলজফি সেইটে না বুঝলে কিছুই বোঝা হয় না। তার জন্যে সময় দরকার। দরকার সহানুভূতির। এ ট্যুরিষ্টের কাজ নয়।

আলেকজাণ্ডার উৎসাহের সঙ্গে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো আহত কুকুরের আর্তনাদের মতো।

চক্ষের পলকে এত বড় হল-ঘরের সমস্ত আলো নিভে গেল। শুধু দু'প্রান্তে দুটি আলো মিটমিট ক'রে জ্বলতে লাগলো। এক মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশ যেন ভয়ে ও দুর্ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে গেল!

সাইরেন অনেকক্ষণ ধরে কাৎরে-কাৎরে কেঁদে চুপ করলো।

কোথাও একটা শব্দ নেই।

বাইরে রাজপথের যান-বাহন, জন-কোলাহল বন্ধ হয়ে গেছে।

সকলে রুদ্ধ-নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

কিসের? মৃত্যুর?

এরোপ্লেনে চড়ে আসছে মৃত্যুর দূত। বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান! অদৃশ্য উর্ধ্বলোক থেকে করবে মৃত্যুবর্ষণ। বাড়ী উড়ে যাবে। মাঠ পুকুর হয়ে যাবে। আর মানুষ মরবে কীটের মতো!

আহত কুকুরের আর্তনাদ থেমেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। শোনা যাচ্ছে, শুধু নিজের হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ী-পেটার মতো শব্দ।

এমনি কাটলো মিনিট দশেক।

তারপরে,—

দুমদুম....দুমদুম........

খুব দূরে........অস্পষ্ট ভাবে........

ওই! আলো নেবাও, আলো নেবাও!

হলের দুই প্রান্তে যে দুটো আলো জ্বলছিল, তাও নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। কে জানে, এই আলো কোনো ছিদ্রপথে যদি বাইরে যায়! মৃত্যুদূতের মোটা-মোটা ফীল্ড্গ্লাসপরা চোখের দৃষ্টি শকুনের মতো তীক্ষ্ণ।

গুম্........গুড়ুম্........

আরম্ভ হয়ে গেল।

খুব দূরে বোধ হয় নয়। হয়তো ড্যালহৌসী স্কোয়ারে কিংবা ফোর্টে।

উপর থেকে পড়ছে বোমা। নিচে থেকে ছুঁড়ছে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ কামান। শব্দ হচ্ছে প্রচুর। এ বাড়ীর দরজা-জানালাগুলো থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

বূ-উ-ম্‌।

প্রচণ্ড শব্দ! এবারে যেন বেশ কাছে। ও-কোণে কে একটি মেয়ে সুতীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে উঠলো।

ভয় সবাই পেয়েছে। সুমিত্রাও। ভয়ে সে আলেকজাণ্ডারের একখানা হাত জড়িয়ে ধরেছে খুব জোরে। কে জানে, এ জীবনের আজকেই শেষ দিন কি না!

তবু নিজের নিজের আসনে বসেই পুরুষেরা যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠে ও-কোণের মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিলে: ভয় কি, ভয় কি!

পঁয়তাল্লিশ মিনিট এমনি কাটলো

বোঁ-ও ও ও........

অসংখ্য মৌমাছি যেন একসঙ্গে গুঞ্জন ক'রে উঠলো।

অল ক্লীয়ার!

আঃ!

আলো, আলো!

আলো জললে দেখা গেল, ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার নেই,—সেই সঙ্গে সুমিত্রাও নেই।

অল ক্লীয়ার দিতেই কখন তারা উঠে চলে গেছে!

শ্রীমন্ত স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

[ ১১ ]

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর।

সে এক স্মরণীয় দিন।

রাত্রে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। চাঁদ ওঠার হু'ঘণ্টা পরেই বাজে সাইরেন। ভীত মানুষ যে যেখানে পারে, আশ্রয় নেয়। জাপানী এরোপ্লেন আসে শহরের মাথায়। বোমা পড়ে,—কখনও শহরের ভিতরে, কখনও বাহিরের শিল্পাঞ্চলে; পরদিন সকাল থেকে আরম্ভ হয় শহর ছাড়বার ধুম।

হাওড়া আর শিয়ালদহ,—হু'দিকের হুটো স্টেশনে সমস্ত দিন রাত্রি জনসমুদ্র গর্জন করছে। ট্রেনের সংখ্যা কমে গেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট সকালের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে বিক্রি হয়। সে আর ক'খানা? তারপরে সারাদিন চলে ঘুষের খেলা। ধনীরা মুঠো-মুঠো নোট দেয় গুঁজে, ট্রেনে ওঠবার তাড়ায়, শহর থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার ব্যাকুলতায়।

মধ্যবিত্তেরাও দিচ্ছে তাদের সর্বস্ব উজাড় ক'রে। যারা চালাক, তারা ফন্দী-ফিকির খুঁজছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে আসবার আগেই কেউ বা হু'টাকা ঘুষ দিয়ে, কেউ বা লুকিয়ে বেড়া টপকে ইয়ার্ডে গিয়ে ঢুকছে।

যারা পারছে না তারা স্টেশনের প্রবেশপথে অপমানিত হচ্ছে, মার

যাচ্ছে। যারা অথম হচ্ছে, দয়া ক'রে তাদের স্টেশনে ফার্স্ট এড দেওয়া হচ্ছে এবং স্ট্রেচারে করে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে উঠিয়েও দেওয়া হচ্ছে। তাদের আহত বিবর্ণ মুখে তখন পরিতৃপ্তির কী হাসি!

এত ঝামেলা যারা পোয়াতে রাজি নয়, তারা চলেছে হেঁটে। কেউ কেউ সপরিবারেই।

নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে মূষিকের মতো মানুষের দল।

কারও মাথায় পাগড়ি, কারও হাতে লাঠি, কারও কাঁধে বাঁক—তাতে তার সমস্ত সম্পত্তি। কেউ চলেছে একা, কেউ সপরিবারে, কচি-কাচা ছেলেপুলে নিয়ে, কারও সঙ্গে গরু-বাছুর-মহিষ।

জনতার যেন আর শেষ নেই!

দেখতে দেখতে চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে। এত লোকও এই ক'লকাতা শহরে ছিল? চলেছে তো চলেছেই। এর আর ছেদ নেই। চৌবাচ্চা খুলে দিলে যেমন হুড় হুড় ক'রে জল বেরিয়ে যায়, এই ছুটি নির্গম পথ দিয়ে তেমনি ক'রে লোক বেরিয়ে চলেছে।

এ ছাড়া নদীপথও আছে। নৌকো ভাড়া ক'রেও বহু পরিবার চলে যাচ্ছে। তিন ঘণ্টার পথ, তিন দিনে পৌঁছুবে। কি আর করা যায়? হাঁটবার শক্তি নেই, ট্রেনে ভিড় ঠেলাও অসম্ভব। তার চেয়ে তিন দিন, তিন দিনই সই।

যারা রইলো তাদের অবস্থাও সুখকর নয়।

সকাল হ'লেই রকম-বেরকমের গুজব উঠছে। সে-সমস্ত শুনলেও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সন্ধ্যে হ'লে যখন পথের লোক যায় বিরল হয়ে, পল্লী স্তব্ধ হয়ে আসে,—তখন ঘরের মধ্যে ব'সে থেকেও গা ছমছম করে। ঘুম আসে না, কখন সাইরেন বাজে!

এই সাইরেন!

আহত মুমূর্ষু কুকুরের আর্তনাদের মতো এই যে ডাক,—বোমার চেয়েও এই ডাক ভয়ঙ্কর। শুনলে মুখ শুকিয়ে যায়, হৃৎ-স্পন্দন বন্ধ হয়, দেহের গাঁটে গাঁটে ঝিন্‌ঝিনি ধরে।

যেন শ্মশানের প্রেতের আর্তনাদ।

শ্রীমন্ত কোথাও যায় নি।

সে অবশ্য বড় কথা নয়। যারা পালাচ্ছে তাদের মধ্যে ঝি-চাকর, রিক্‌শওলা-ঘোড়াগাড়ীওলা-ফিরিওলা, কুলী-মজুর আর ছোট-বড়-মাঝারি ব্যবসাদারের সংখ্যাই বেশি। চাকুরী-জীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কমই পালাচ্ছে। তারা যে সাহস বেশি ব'লে পালাচ্ছে না তা নয়, এখনই-এখনই চাকরী ছেড়ে পালানো তারা শ্রেয় মনে করছে না। তারাও পালাবে। সত্য কথা বলতে কি, পালাবার জন্যে তারা সকল সময় তৈরি হয়েই রয়েছে। কেবল আরেকটু না দেখে পালাতে প্রস্তুত নয়।

সুতরাং শ্রীমন্ত যে পালায়নি তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাদের অফিসের মোটে তিনজন ছাড়া আর কেউ পালায়নি। আশ্চর্য এইখানে যে, সে বলে, তার ভয় করে না।

ক'লকাতা শহরে এখন বাড়ীর অভাব নেই। সস্তায় চমৎকার একখানা বাড়ী সে ভাড়া করেছে।

সেই রাত্রের পর হোটেলে সে বড় একটা আর যায় না। সন্ধ্যার পরে আজকাল বাইরে কোথাও বেরুনো ঠিকও নয়। অফিসেও আজকাল সে আর অত রাত্রি করে না। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে।

হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক ছেড়ে আজকাল সে বাইরের বারান্দায় এসে বসে।

মেয়েছেলে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার পর বাড়ী পাহারা দেবার কাজ বড়বাবুর কমেছে। তিনিও মাঝে মাঝে আসেন। মাঝে মাঝে আসে আলেকজাণ্ডার। তার সঙ্গে শ্রীমন্তরও খুব ভাব জমেছে। দুজনে দুজনকে নাম ধ'রেই আজকাল ডাকে। শ্রীমন্ত ডাকে হেনরি বলে, আর আলেকজাণ্ডার বলে, মন্টি।

ওদের দুজনের এই ঘনিষ্ঠতায় সুমিত্রা খুশি নয়।

শ্রীমন্ত তা বুঝতে পারে। কিন্তু কি করবে? রাগ ওর আসে না, ওর মনে 'জেলাসি' ব'লে কিছু নেই। মনের 'ফ্রণ্টে' সুমিত্রা ক্রমাগত সৈন্য-সমাবেশ করছে। কিন্তু শ্রীমন্তের সেজন্যে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা আছে ব'লে মনে হয় না। সে যুদ্ধ করবেই না।

এমন কি সেই হাওয়াই-হামলার রাত্রে সুমিত্রা যে হেনরির সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তাকে একলা ফেলে রেখে, তার জন্যে আজ পর্যন্ত কোনো দিন একটা কৈফিয়ৎও সে চায়নি।

সুমিত্রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা কৈফিয়ৎ হয়তো দিতে চেয়েছে। কিন্তু তার ভণিতাতেই আন্দাজ পেয়ে শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি অন্য বিষয়ের অবতারণা করেছে।

ভেবে পায় না সুমিত্রা, এ রাগ, না অভিমান, না ঔদাসীন্য?

শুধু শ্রীমন্ত জানে, ওসব কিছুই নয়। হৃদয়বৃত্তির চর্চা করার সময় তার নেই। জীবনের গতিপথে কালো ঘোড়ার মতো সে ছুটে চলেছে আপন লক্ষ্যের দিকে। তার ভাগ্যদেবতাই জানে, সেখানে তার জন্যে কি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে—অভিশাপ, না আশীর্বাদ। যা-ই থাক, সে-ই তার একান্ত লক্ষ্য। এ পথে হৃদয়ের কোনো স্থান নেই।

মানুষের মূল্য তার কাছে প্রয়োজনের তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়।

কারবার চলে 'cash and carry'র। তার মধ্যে রাগ-অভিমানের বালাই নেই।

বড়বাবু, সুমিত্রা, হেনরি, এদেরকে তার প্রয়োজন। সেই হিসাবেই এদের সে খাতির করে, যত্ন করে এবং এদের পিছনে খরচও করে। তার জন্যে ওরা সবাই খুশি।

বাদে সুমিত্রা। সেই কেবল মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। মাঝে মাঝে বুঝতে পারে না শ্রীমন্তর ব্যবহারে সে চটবে কি খুশি হবে। পুরুষমানুষের মনে 'জেলাসির' বাষ্প পর্যন্ত নেই, একথা ভাবতেও ওর অবাক লাগে।

এ কি ক'রে সম্ভব হয়?

সুমিত্রা ভাবে, কিন্তু ভেবেও কোনো কিনারা পায় না।

প্রতিদিনের মতো আজকেও শ্রীমন্ত অফিস থেকে ফিরে বারান্দার উপর থেকে চলমান জনতা দেখছিল।

প্রথম দু'দিনের পরে জনতা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। তবু এখনও কম নয়। সেই জনতার স্রোতে তার মন করবী ফুলের মতো নিরুদ্দেশ ভেসে চলেছে।

হঠাৎ পিছন থেকে তার পিঠের উপর একটা টোকা পড়লো।

—সুমিত্রা? এসো, বসো।

শ্রীমন্ত খুশি হয়ে উঠলো। তার মন কোনো কারণেই এমন ক'রে ভেসে চলে, এ সে সহ্য করতে পারে না। সুমিত্রা এলো, ভালোই হ'ল। একটা নোঙরের তার দরকার ছিল।

—কি দেখছিলে? জনতা?

—হ্যাঁ।

শ্রীমন্ত পাশের চেয়ারে বসে বললে, দেখছিলাম, ওদের মুখে কি লেখা রয়েছে।

—কি দেখলে ?

—দেখলাম, শুধু ভয় নয়।

তবে ?

—পিছন থেকে ভয়ের একটা ঠেলা অবশ্য আছেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সামনের একটা টানও আছে।

—সে টানটা কিসের ?

—বুঝলে না ? গেল বারে ইভ্যাকুয়েশ্যনে যাদের বাইরে পাঠিয়েছে, মা-বাপ-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, টানছে তারা। ট্রেনে এখনও যথেষ্ট ভিড়। বড়বাবুকে বললাম, এই ভিড়ে একটা দিনের জন্যে কেন কষ্ট ক'রে দেশে যাচ্ছেন ? বললেন, 'বোঝ না ভায়া, বাড়ীতে সবাই ভাবছে। খবরের কাগজে যা পাচ্ছে তা তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখে না দেখা পর্যন্ত তারা শান্ত হতে পারবে না।' সেই থেকেই কথাটা ভাবছি।

—ভেবে কিছু কিনারা পেলে ?

এমন সময় ভারি বুটের শব্দ ক'রে হেনরি এল। তাকে সংবর্ধনা জানিয়ে শ্রীমন্ত সুমিত্রার কথার উত্তর দিলে।

—কিনারা ঠিক পাইনি। তবে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে যেন পায়ে মাটি ঠেকচে।

হেনরি জিজ্ঞাসা করলে, কিসের মাটি ?

শ্রীমন্ত হেসে বললে, কবরের। শোনো হেনরি, আমাদের সম্বন্ধে তুমি কি ধারণা নিয়ে যাবে জানিনে। কিন্তু ক'টা কথা তোমার জানা দরকার।

হেনরি আগ্রহে বললে, কি ?—বল।

শ্রীমন্ত বললে, আমাদের একটা বদনাম আমরা ভীরু। বাইরে থেকে দেখলেও তাই মনে হবে। সেটা সত্যি নয়।

হেনরি বললে, সত্যিটা তবে কি ?

—সত্যি এই যে, আমরাও তোমাদেরই মতো সাহসী।

—প্রমাণ করো।

প্রমাণ করছে, ভারতের সৈন্যবাহিনী।

—আর এই যারা পালাচ্ছে ?

—তারাও ভীরু নয় সবাই।—শ্রীমন্ত চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলো —ইউরোপের যে সব সহরে বোমা পড়েছে সেখানকার কথা ভাবো। এমন কি, তোমার লণ্ডনের লোকেরাও এর চেয়ে সাহস দেখায়নি। তারপরে, বলতে পারো এখানে থেকে এরা প্রাণ দেবে কিসের জন্যে ? একি স্বাধীন দেশ ? না ওদের হাতে অস্ত্র আছে ?

হেনরি জিজ্ঞাসা করলে, অস্ত্র তুমি কাকে বলো ? তলোয়ার ? রিভলবার ? বন্দুক ? কিন্তু সে নিয়েও তো হাওয়াই-হামলা ঠেকানো যায় না।

এবারে সুমিত্রা উত্তর দিলে। বললে, না, যায় না। তবু তাতে মনের বল বাড়ে। ভাবো তো হেনরি, এত বড় দুর্দিনেও যারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও বন্দুক-রিভলবার ব্যবহারের অনুমতি পেলে না, আত্মরক্ষার জন্যে তাদের পলায়ন ছাড়া আর কি রইল ?

এই উত্তরে হেনরি এবং শ্রীমন্ত উভয়েই হেসে উঠলো।

শ্রীমন্ত বললে, তাছাড়াও কথা আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা তোমাদের মতো মরিয়া হ'তে পারি না।

—কেন পারো না ?

—সেই কথাই সুমিত্রাকে বলছিলাম। পারি না আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থার জন্যে। আশ্চর্য একটা ব্যবস্থা ! কিন্তু দাঁড়াও, তার আগে তোমাদের চা'য়ের কথাটা ব'লে আসি।

হেনরি না বলে পারলে না : বলে আসতে হবে কেন মন্টি, এখানেই তাকে ডাকো না ?

—তা সম্ভব নয় ;—গম্ভীরভাবে শ্রীমন্ত বললে,—কারণ, এই নতুন লোকটি বদ্ধ কালা।

—সর্বনাশ !

—কিছু সর্বনাশ নয়, বরং ভালোই হয়েছে। সাইরেন যখন বাজে তখন ও নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। বোমার শব্দে ওর ঘুমও ভাঙ্গে না, ভয়ও করে না।

শ্রীমন্ত হাসতে হাসতে চলে গেল।

ফিরে এসে শ্রীমন্ত বলতে লাগলো :

—আমাদের এই দেশকে যদি বুঝতে চাও, তাহ'লে সব চেয়ে আগে বুঝতে হবে এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা। একান্নবর্তী পরিবার যে কি বস্তু সে তোমার ধারণা নেই। একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর নির্ভর ক'রে থাকে বৃদ্ধ বাপ-মা, বিধবা পিসিমা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, নাবালক ভাই-বোন, অনেকে। তারপরে ধরো,—এদেশে বিধবা-বিবাহ নেই। তোমরা যুদ্ধে এসেছ, তোমাদের এই ভরসা আছে, কারও মৃত্যু হ'লে তার স্ত্রী একেবারে পথে বসবেন না। প্রথমতঃ, তাঁর নিজের উপার্জন করবার শক্তি আছে ; দ্বিতীয়তঃ, তিনি হয়তো আবার বিবাহ ক'রে ঘর-সংসার পাতবেন। কিন্তু এদেশের কথা ভাবো : স্বামীর মৃত্যু হ'লে স্ত্রীর ভাই কিংবা দেওরের গলগ্রহ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হেনরি বললে, কিন্তু এই তো, মিস্ রয় চাকরী করছেন ?

সুমিত্রা হেসে বললে, করছি। কিন্তু এত বড় দেশে আমাদের মতো মেয়ের সংখ্যা কত ? তাছাড়া, তুমি জানো না, এর জন্য আমাদের এই মুষ্টিমেয় ক'জনকে কত বাধা এবং নিন্দার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

শ্রীমন্ত বললে, তাছাড়াও বাধা আছে। আজ যুদ্ধের জন্যে চাকরী সুলভ হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় বারো আনা ছেলে বেকার থাকে। এর উপর মেয়েরাও যদি চাকরী খুঁজতে আরম্ভ করে, তাহলে বেকার-সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

চাকরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। সুমিত্রা উঠলো চা তৈরি করতে।

সুমিত্রা হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এই লোকটি কালা ?

শ্রীমন্ত বললে, হ্যাঁ। বদ্ধ কালা। প্রথম দিন বোমা পড়তেই সে চাকরটা পালিয়েছে। বহু কষ্টে দ্বিগুণ মাইনেতে একে পেয়েছি। কানে শোনে না। ভরসা হচ্ছে, বোমায় একে ভয় দেখাতে পারবে না। কি বল ?

সবাই হেসে সম্মতি দিলে।

ওর হাতে একটা টাকা দিয়ে শ্রীমন্ত ইসারায় এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বললে।

লোকটি বললে, ভাঙানী ছাড়া দেবে না।

বিরক্ত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে শ্রীমন্ত বললে, ভাঙানীর দরকার নেই, ওতে যত প্যাকেট হয় নিয়ে আয়। পয়সা কিছু বাঁচলে দেশলাই নিয়ে আসবি। বুঝলি ?

লোকটি বুঝলে কি না, কে জানে! বাবুর চীৎকারে ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

শ্রীমন্ত ওদের দিকে চেয়ে বললে, এই আর এক বিপদ হয়েছে। চাকরটা পালিয়ে যাওয়ার পর দুদিন চা খেতেই পেলাম না। এ পাড়ার চায়ের দোকান সব বন্ধ। মুদির দোকান, তাও বন্ধ। এ রকম করে ক'দিন চলবে ?

চিন্তার কথা!

সুমিত্রা বললে, এমনি একটা কালা আমাকে যোগাড় করে দিতে পার?

শ্রীমন্ত হেসে বললে, দেখব।

তারপর বললে, কী লোকটাই পালালো এবং এখনও পালাচ্ছে! কদিন ধরেই ভাবছি এদের কথা! আমার কি মনে হচ্ছে জানো? প্রাণের ভয় একটা মস্ত বড় কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাও এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। অনেকে শুধু বুড়ো বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্রের চিন্তিত মুখ স্মরণ করেই পালিয়েছে। নইলে হয়তো থেকে যেত।

হেনরি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ঘাড় নীচু করে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে লাগলো। তারপর বললে, তুমি যা বলছ মন্টি, সে অসম্ভব নয়। অন্ততঃ এর মধ্যে ভেবে দেখবার ব্যাপার আছে। আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মেয়েদের অসহায় ক'রে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছ। এখন দুঃখ করা বৃথা। তোমাদের পায়ে পরাধীনতার বেড়ি এবং সমাজ-ব্যবস্থার বেড়ি পরস্পর জড়িয়ে গেছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কিছু চিন্তা করেছ?

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, আমার কথা ছেড়ে দাও। এদেশের যাঁরা জ্ঞানে, চিন্তায়, কর্মে সকলের বড়,—যাঁরা অন্য দেশের কারও চেয়েও ছোট নন, তাঁরা চিন্তা করছেন। কিন্তু কিনারা পেয়েছেন বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের যত কিছু সমস্যা সব পরস্পর সম্বদ্ধ হয়ে একটা দুষ্টচক্রে ঘুরছে। এর মধ্যে একক কোনোটিকে আলগোছে তুলে নিয়ে সেই সমস্যাটির সমাধান করবে তার উপায় নেই। অনেক চিন্তা করে দেখা গেছে, আমাদের দেশের পরাধীনতার সমাধান না হলে কোনটিরই সমাধান সম্ভব নয়।

হেনরি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, ততদিন অন্ত সমস্তাগুলি অপেক্ষা করে থাকবে?

—উপায় কি?—হেনরির মুখের দিকে চেয়ে হেসে শ্রীমন্ত বললে, আমি বুঝতে পারছি, তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মার্কিন স্বাধীনতা-যুদ্ধের কালে যাঁরা জন্মেছিলেন, তোমার সেই পূর্বপুরুষদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আমার কথাতেই সায় দিতেন।

অজ্ঞাতসারে শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। সেটা ওর পক্ষে এমনই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে স্থমিত্রা পর্যন্ত চায়ের পেয়ালার ফাঁক দিয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলে।

[ ১২ ]

ছর্ভিক্ষ যে আসন্ন একথা গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর সবাই বুঝেছিল।

জাপানী সৈন্য বাঙলা ও আসামের সীমান্তে এসে থমকে গেল। মাঝে মাঝে বোমা ফেলে ভয় দেখায়। কিন্তু আসে না অথচ মালয়-সিঙ্গাপুর-বর্মার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যে গবর্ণমেণ্টের সতর্কতার আর অন্ত নেই। নৌকো-সাইকেল তো গেছেই, চালও যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

চালের দর হু হু বেড়ে চলে। গবর্ণমেণ্ট ভরসা দেন, ও কিছু নয়, ইনফ্লেশন। মানুষের টাকা সস্তা হয়েছে।

চাল পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট বললেন, চোরাবাজার! হুমকি দিলেন, তিন দিনের মধ্যে সব চোরাবাজারীকে সায়েস্তা করে দেওয়া যাবে। তাহলেই আর চালের অভাব থাকবে না।

ফাঁকা ভরসায় পেট মানে না। পাড়াগাঁ থেকে ভিক্ষুকের আমদানী হতে লাগলো।

একদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীমন্ত করযোড়ে বড়বাবুর কাছে এসে দাঁড়ালো।

বড়বাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ?

—দরবার আছে।

—হুকুম হোক !

—আমাদের মহেন্দ্র গেছে সিভিল সাপ্লাইএ ভালো চাকরী নিয়ে।

—তারপরে ?

—তিন জন মক্কেল আছে, কণ্ট্রোলের দোকান চায়।

—কি রকম খরচ করবে ?

—বলেছে, দোকান পিছু হাজার টাকা।

—আর কিছু উঠবে না ?

—উঠতে পারে।

—বখরা কি রকম ?

—মহেন্দ্রের আট আনা, আপনার পাঁচ আনা, আমার তিন আনা ?

বড়বাবু ভেবে বললেন, বেশ। এখন কি তাকে ফোনে পাওয়া যাবে ?

—বোধহয় না। কাল অফিসের সময় মনে পাড়িয়ে দোব বরং। কিংবা যদি বলেন, ফেরবার মুখে তার বাড়ীতে খবর দিয়ে যেতে পারি। আমি তার বাড়ী চিনি।

খুশি হয়ে বড়বাবু বললেন, ভালো। শুভস্য শীঘ্রম্। বোলো, কাল সকালে আমার বাড়ীতে যেন দেখা করে।

মহেন্দ্র বড়বাবুর বিশেষ অনুগত লোক, একথা শ্রীমন্ত বেশ ভালো

করেই জানে। অফিস বদলালেও সেই আনুগত্যের জের এখনও মেটেনি তাও সে জানে।

সুতরাং বড়বাবুর আশ্বাস পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

চোরাবাজার ! চোরাবাজার ! চোরাবাজার !

ক্ষুধিত মানুষ চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট টাকা মণ দিয়ে সেখান থেকে চাল কিনে নিয়ে আসে। আশ্চর্য এই যে গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই সে সব জায়গার ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারলেন না। পুলিস হেঁসেলের কোণ থেকে রিভলবার বার করে, কলেজের ছেলের পকেট থেকে বার করে অননু-মোদিত ইস্তাহার। কিন্তু হাজার হাজার বস্তা চাল কোন্ গুদামে লুকানো আছে কিছুতেই তার কিনারা করতে পারলে না।

অবশেষে চোরাবাজারের পাশাপাশি চলতে লাগলো কণ্ট্রোলের চালের দোকান !

মহেন্দ্রের অনুগ্রহে শ্রীমন্ত এমনি তিনখানা কণ্ট্রোলের দোকান বেনামীতে পেয়ে গেল। একখানা গ্রে স্ট্রীটে একখানা চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে, আর একখানা আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

চাল যা আসে তার অর্ধেক, কখনো বা বারো আনা চড়াদামে চলে যায় চোরাবাজারে। সেখান থেকে আরও চড়াদামে যায় ক্ষুধিত নাগরিকের রান্নাঘরে। বাকি যা থাকে, তাই কণ্ট্রোলের দরে সারবন্দী লোকদের বিক্রী করা হয়। মুষ্টিমেয় জনকয়েক পায়, অবশিষ্ট লোক সমস্ত সকাল প্রত্যাশার পর হতাশ হয়ে ঘরে ফেরে।

শ্রীমন্তের ব্যাঙ্কের অঙ্ক দিন দিন স্ফীত হয়ে ওঠে।

আর সে কী চাল !

মাত্র দুর্ভিক্ষের দিনে বিচারবিহীন জঠরাগ্নিই সেই কদন্ন গ্রহণ করতে পারে! দুটো বৎসর আগে যে-চাল ভিক্ষুকে ভিক্ষা নিতেও সম্মত হ'ত না, তাই কিনছে লোকে চতুর্গুণ মূল্য দিয়ে, কত ক্লেশ স্বীকার ক'রে; না পেলে তার ক্ষোভের আর সীমা থাকে না! যেন কত পরম-পদার্থ!

ভোরে উঠে শ্রীমন্ত বেরিয়ে যায় দোকান তদারক করতে। দেখে দুর্গত মানবের সারি তার দোকানের নিচেথেকে অজগর সাপের মতো এঁকে বেঁকে পাশের গলির ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে।

একদিকে পুরুষের—একদিকে স্ত্রীলোকের সারি এক মুষ্টি চালের জন্য ঠেলাঠেলি করছে।

শ্রীমন্ত ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। ভদ্রঘরের লোকও আছে,—স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় সারিতেই। সেই কোন্ ভোরে এরা 'কিউ'তে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের আগের দিকে যারা দাঁড়িয়ে তারা রাত থেকেই ওইখানে রয়েছে।

মাঝে মাঝেই গুঁতোগুঁতি চলছে। সামনের দিকের নীচ শ্রেণীর ক'টি স্ত্রীলোক বিশ্রীভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। সে কানে শোনা যায় না। সিভিক গার্ডের ছেলেরা তাদের ধমকাচ্ছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে।

নিঃশব্দে।

তার শীর্ণ দেহথেকে সমস্ত লাবণ্য এখনও মিলিয়ে যায় নি। পরনে একখানা মোটা শাড়ী। একটু আগে ওদের মাথার ওপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে কাপড়খানি ওর গায়ে একেবারে লেপ্টে রয়েছে। মাথায় ঘোমটা বোধ করি ছিল, কিন্তু ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ির মধ্যে কখন যে তা খুলে গেছে, তা সে নিজেও টের পায়নি।

অদূরে একটা চারা গাছের নিচে এগারো-বারো বছরের একটি শীর্ণদেহ স্ফীতোদর বালক ওর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পা ব্যথা করলে একটু বা বসছে। বোধ করি, মেয়েটির ভাই কিংবা দেবর হবে।

মেয়েটির অনাবৃত কৃশ মুখের দিকে চেয়ে শ্রীমন্তর চোখে সাপের মতো হিংস্র দৃষ্টি লিক-লিক করে উঠলো।

তারপরে আস্তে আস্তে সে আবার অন্য দোকানের দিকে চলে গেল সর্বত্রই একই দৃশ্য। অস্থিচর্মসার নর ও নারীদেহের যাদুঘর !

কি একটা ছুটির দিন ছিল।

বাইরের দিকের খোলা বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার টেনে শ্রীমন্ত বসে বসে একখানা সস্তা ইংরেজি নভেল পড়ছিল।

একটু আগে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। চাকরটা এসে দক্ষিণ দিকের ভারী পর্দাটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও সেটা এখনও তেমনি ফেলাই রয়েছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে পর পর দু'খানা গরুর গাড়ী যাচ্ছে। তার পিছন-পিছন লোক চলেছে এক পাল। কৌতূহলী হয়ে শ্রীমন্ত রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো।

কয়লার গাড়ী !

গাড়ীর উপরেই একটা বস্তার উপর কালো গেঞ্জী-পরা কয়লাওয়ালা বসে ছিল। ভিড় দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছে। কখনও রেগে, কখনও স্তোক-বাক্যে সে অনুসরণকারী জনতাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে ?

—শুনুন বাবুমশাইরা, সারাদিন শরীরের উপর দিয়ে ধকল গেছে। এখন যাব, চান করব, দুটো খাব। কাল সকাল! নইলে আর কয়লা বিক্রী করতে পারবো না।

—ওরে বাবা, কাল সকাল! সকালে তোমার দোকানে কয়লার একটা গুঁড়োও থাকবে না। রাত্রেই তুমি ব্লাক-মার্কেটে চালান করে দেবে। তোমাকে চিনি না, বাবা! চলো, যত রাত্রি হয় আমরা বসে থাকব, কয়লা নোব, তারপর বাড়ী যাব। কাল থেকে রান্না বন্ধ আছে!

শ্রীমন্ত মুচকি হেসে সরে এল।

এ তো সামান্য! তার কণ্ট্রোলের দোকান তিনটেয় কান্নাকাটি চলছে প্রত্যহ। সেদিন একটা বুড়ি আধসের চালের জন্যে তার দোকানের বারান্দায় এমন করে মাথা কুটলে যে রক্তারক্তি কাণ্ড!

কী করা যাবে? ছ' হাজার টাকা শুধু প্রণামী দিতে হয়েছে। সে-টাকা তুলতে হবে না? মমতা করলে এ বাজারে চলে কই?

সুমিত্রা এল।

পরনে জাফরানী রংয়ের শাড়ী। যেন ওর দেহের ওপর ক্ষান্ত বর্ষণের ঘনঘটা নেমেছে।

শ্রীমন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলো: এসো, এসো।

সুমিত্রা শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, কিছু চিনি যোগাড় করে দিতে পারো? কাল থেকে গুড় দিয়ে চা হচ্চে। আমরা কোনো রকমে চালাচ্ছি। কিন্তু বাবা বুড়োমানুষ, তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, এমন চমৎকার বর্ষার অপরাহ্নে তোমায়-আমায় কথা আরম্ভ হবে কি চিনি, চাল, কয়লা নিয়ে?

অপ্রস্তুতভাবে হেসে সুমিত্রা বললে, কী করা যায়? এখন ওই হয়েছে মানুষের জপ-মন্ত্র। আমাদের একজন প্রোফেসর, স্থূল বিষয় নিয়ে তাঁকে কোনো দিন কথা বলতে শুনিনি। একটু আগে রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই জিগ্যেস করলেন, চাল পাচ্ছ তো মা?

দুজনেই হেসে উঠলো।

সুমিত্রা হাসি থামিয়ে বললে, হাসির কথা নয় মন্টি (হেনরির দেখাদেখি ও আজকাল মন্টি বলছে)! এ আমরা কোথায় চলেছি? চাল-চিনি-নুন-কেরোসিন, এসব কোথায় গেল অদৃশ্য হয়ে? কোন্ অতলস্পর্শী গহ্বরে?

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, সেটা জানতে পারলে তো ভাবনা চুকেই যেত!

—সে কি কোনো দিন জানা যাবে না?

—কোনোদিনের কথা জানি না সুমিত্রা, তবে এখন যে জানা যাবে না, তা বলতে পারি।

—কি ক'রে?

—কারণ, তাহলে ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ হয়ে যায়।

দু'জনেই হেসে উঠলো।

সুমিত্রা বললে, দু-একটা চোরাবাজারী ধরা পড়েছে কিন্তু।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, হ্যাঁ। যেমন আমার চাকরের মাসী। দেশে ফসল নেই। সে আসছিল কলকাতায় দাসীবৃত্তি করতে। শুনেছে কলকাতায় চাল পাওয়া যাচ্ছে না। নিজের খাবার জন্ত সের দুই চাল আনছিল সঙ্গে ক'রে। শেয়ালদা স্টেশনে ধরা পড়ে গেল!

—বড়রা ধরা পড়ছে না কেন?

শ্রীমন্ত মুচকি হেসে বললে, কি করে জানব?

—লোকেরাই বা ধরিয়ে দিচ্ছে না কেন?

—কি হবে? চোরাবাজারী কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাবে। মাঝেথেকে, সে যে চাল পাচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে। দুর্নীতি কতদুর প্রবেশ করেছে বুঝতে পারছ?—সমাজের একেবারে মেরুদণ্ডে। এরপরে যুদ্ধ একদিন থামবে, ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ হবে। কিন্তু এই যে দুর্নীতির যক্ষ্মা—এ সহজে সারছে না।

একটু থেমে শ্রীমন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বললে, এই চোরাবাজারীদের জনে-জনে শূলে দেওয়া উচিত!

ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি। সন্ধ্যার পরেই বারান্দায় ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। এখন আবার নতুন ক'রে বৃষ্টি নামলো ঝমঝমিয়ে। ছাট আসছে বারান্দায়। সুমিত্রার হাত ধ'রে শ্রীমন্ত ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।

তারপরে কচি কলাপাতা রঙের একখানি মূল্যবান বেনারসী শাড়ী ওর হাতে তুলে দিলে।

বললে, ভেবেছিলাম, এই দিয়ে আজ আমাদের আলোচনা আরম্ভ হবে। কিন্তু তুমি নুন-তেল-লকড়ির কথায় সব মাটি ক'রে দিলে!

খুশিতে সুমিত্রার চোখ-মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো। এ কাণ্ড কখন করলে?

—আজ সকালে।

কিছু চাল ব্ল্যাকমার্কেট ক'রে আজ সকালেই হাজারখানেক টাকা পেয়েছিল। তাই থেকে পাঁচশো টাকা দিয়ে সুমিত্রার জন্যে এই শাড়িখানা সে কিনেছে।

জিজ্ঞাসা করলে, পছন্দ হয়েছে?

উত্তরে সুমিত্রা একেবারে ওর বুকের কাছে সরে এলো। হাসিভরা মুখ ওর দিকে তুলে বললে, How nice of you!

একটা দমকা হাওয়া হুড়-মুড় ক'রে ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হ'ল।

সুমিত্রা সভয়ে বললে, সর্বনাশ! আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে কিন্তু।

শ্রীমন্ত হেসে বল্‌লে, বৃষ্টিটা থামুক!

[ ১৩ ]

মা,—মাগো,—দুটি খেতে দাও মা!

এই কান্না যেন ক্ষুধার্ত ক'লকাতার মর্মস্থল থেকে দিন রাত্রি উঠছে। গৃহস্থের আহার-নিদ্রা বিষিয়ে উঠলো। সমস্ত সময় মানুষের কানে এই একটি সুর নিদ্রায়-জাগরণে বেজে চলেছে: মা, মাগো....

পথে-পথে প'ড়ে রয়েছে দুর্গতের শবদেহ। অস্থি-চর্মসার বীভৎস মুখে ওরা যেন প্রচলিত সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থাকে মুখ ভেঙাছে। চোখে দেখা যায় না। প্রথম প্রথম পথচারী চমকে উঠতো। কিন্তু তাও ধীরে ধীরে সয়ে এল।

'দেবধামে'র ঘোষ-পরিবারে দুর্গতির আর সীমা রইলো না।

দেবসেবার জন্যে আতপ চালের প্রয়োজন। সে কোথায় পাওয়া যায়? আশ্রিত-পরিজন, বামুন-চাকর-ঝি, সব মিলিয়ে অনেকগুলি প্রাণী। এতগুলি প্রাণীর চালই বা কোথায় পাওয়া যায়?

হিমাংশুবাবু সদাশিব লোক। এসব কথা তাঁর কানে কেউ বড় একটা তুলতো না। কর্মচারীরা যেখান থেকে পারতো চাল যোগাড় করতো, তাঁর জন্যে মিহি চালও। দামের প্রশ্ন এখন আর ওঠে না। সুতরাং এতে কর্মচারীদের দু'পয়সা থাকতো।

ইতিমধ্যে মিহি চাল একদিন আর কোনক্রমেই পাওয়া গেল না। হিমাংশুবাবু খেতে ব'সে চমকে উঠলেন!

এ কী চাল! যেমন মোটা, তেমনি বিচিত্রবর্ণ, তেমনি কাঁকর!

গৃহিণী কাঁচুমাচু ক'রে বললেন, এ ছাড়া আর কোনো চাল পাওয়া গেল না।

ঋণের দায়ে হিমাংশুবাবু বিব্রত। এবং ঋণ যত বাড়ছে, তাঁর মদ্যপানও তত বাড়ছে; বাড়তে বাড়তে এখন এমন হয়েছে যে, দিন-রাত্রির খুব অল্প সময়ই তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন।

কিন্তু চালের দিকে চেয়ে তাঁরও নেশার ঘোর কেটে গেল।

শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, দুর্ভিক্ষ কি তাহ'লে সত্যিই আরম্ভ হয়েছে? আমি ভাবছিলাম, খবরের কাগজের কারসাজি।

হিমাংশুবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

গৃহিণী বললেন, ভিখিরীদের ডাক তোমার কানে যায় নি?

—ডাক! কি ডাক? শুনিনি তো!

নোয়াখালির মহালটা বিক্রি হয়ে যাবার পর থেকেই উনি আর বাইরের বালাখানায় যান না। মোসাহেবের দলও কিছুদিন ব্যর্থ চেষ্টার পর তাঁকে ত্যাগ করেছে। যে-ঘরে আগে শ্রীমন্ত থাকতো, সেই ছোট ঘরটিতেই এখন তিনি একা দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় থাকেন।

কেউ তাঁর কাছে আসে না। তিনিও কোথাও যান না। ভিখিরীর কান্না এতদূরে পৌঁছয় না। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে যদি-বা পৌঁছয়, হিমাংশুবাবু তখন প্রকৃতিস্থ থাকেন না।

অনুযোগের সুরে গৃহিণী বললেন, তুমি একটু জাগো, চোখ মেলে চাও, কি ঝড় যে বয়ে যাচ্ছে একবার দেখ!

হিমাংশুবাবু একটু চুপ করে থেকে করুণ কণ্ঠে বললেন, আমার

আর সামর্থ্য নেই গিন্নি। আমার ভরসা তোমরা ছেড়ে দাও। শঙ্করকে ধরো। তাকে মানুষ ক'রে তোলো। দুঃখ যে কি তাকে চিনতে দাও।

—কী যে বলো তুমি! শঙ্কর ছেলেমানুষ সে কি করতে পারে?

—না পারে, সব যাবে। আমি কি করব? আমার আর শক্তি নেই।

হিমাংশুবাবু অনেক ভেবেচিন্তে এক গ্রাস ভাত মুখে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেমন একটা দুর্গন্ধে নাক সিঁটকে ভাত ফেলে দিলেন। তারপরে একটু তরকারি, একটু মাছ মুখে দিয়ে উঠে পড়লেন।

ম্লান হেসে শান্তকণ্ঠে বললেন, আজ পারলাম না গিন্নী। কিন্তু তুমি ভেবো না, আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। তোমরা এই চালই খাও তো? বেশ, বেশ।

যেমনকার ভাত তেমনি প'ড়ে রইল।

গৃহিণী কাঠের মত শক্ত হয়ে ব'সে রইলেন। একটা কথাও বলতে পারলেন না। দুঃখের তাতে শঙ্কর যেন অকালেই পেকে যাচ্ছে।

নোয়াখালির মহালটা বিক্রি হয়ে যাবার খবর পেয়েই বাসন্তী এবং হৈমন্তী দু'জনেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

কিন্তু হিমাংশুবাবু কোথায়? কার কাছে তারা দুঃখ জানাবে? হিমাংশুবাবু তখন বাইরের বালাখানায় ইয়ার-বক্সি নিয়ে সন্ধ্যারমজলিসের পরিকল্পনা তৈরী করছেন। তাঁকে পাওয়া অসম্ভব।

তাঁর বদলে পেলে শঙ্করকে।

ছেলেমানুষ ব'লে তাকে তারা নিষ্কৃতি দিলে না। যা-কিছু উপদেশ

দেবার, বাবাকে যা-কিছু বলবার, সে সমস্ত তারা তাকেই ব'লে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল।

নায়েব-গোমস্তা-কর্মচারীর দল, তারাও তাকেই সব জানাতে লাগলো : বড়বাবু যে-রকম ক'রে চলেছেন, তাতে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উড়ে যেতে বেশি দিন লাগবে না। কিন্তু তিনি তো শুনবেন না। তিনি চোখ বুঁজে ছুটে চলেছেন অন্ধকার গহ্বরের দিকে। এখন শঙ্কর যদি শোনে,—সে যদি বোঝে।

শঙ্কর শোনে। যেখানে যা-কিছু দুঃসংবাদ সব তার কানে এসে পৌঁছয়। বোঝবার বয়স তার হয়নি, তবু বোঝবার চেষ্টা করে, ভাবে।

এবং এত অল্প বয়সে ভাবতে শিখলে যা হয়, শঙ্কর অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল। বাইরে বেরুতে তার ইচ্ছা করে না। বেরুলেই চোখে পড়ে অস্থি-চর্মসার নরনারী ও বীভৎস মৃতদেহ। সে দৃশ্য সে সইতে পারে না।

বাইরে সে বেরোয় না। বাড়ীতেও সঙ্গী কেউ নেই। একলা ব'সে ব'সে ভাবে, এই বৃহৎ বাড়ী,—এর পরিণাম কি!

সেদিন হিমাংশুবাবু ভিতরে এলে, ও নিঃশব্দে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো।

অনেকদিন পরে ওকে দেখে হিমাংশুবাবু যেন চমকে উঠলেন :

—তুমি এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?

শঙ্কর উত্তর দিলে না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ নামিয়ে বললে, আমি বলছিলাম, এতগুলো ঝি-চাকর রাখার দরকার কি?

ওর বিজ্ঞজনোচিত কথায় ভঙ্গিতে হিমাংশুবাবু বিস্মিত হলেন।

একটু ভেবে বললেন, এত বড় বাড়ী, এর চেয়ে কম দাসী-চাকরে কি চলবে?

—চালাতে হবে। যখনকার যেমন।

হিমাংশুবাবুর মুখ পলকের জন্যে বিবর্ণ হয়ে গেল। এই দুধের ছেলে, এও বুঝেছে তারা ধীরে ধীরে দরিদ্র হয়ে আসছে!

এক মিনিটের জন্যে তাঁর মুখ থেকে যেন কথা বেরুলো না।

কোনো রকমে স্খলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কি বলেন?

—মাও বলেন, এত ঝি-চাকরের দরকার নেই।

—তাহ'লে তাই করো, আসছে মাস থেকে জনকয়েক ছাড়িয়ে দিও।

হিমাংশুবাবু আবার বেরিয়ে গেলেন।

শঙ্কর বুঝলে, তিনি মনে কষ্ট পেলেন এবং এই কষ্ট ঢাকবার জন্যেই বাইরে গেলেন। দেখে তারও কষ্ট হ'ল। কিন্তু কি করা যায়? এ সময় একটু শক্ত হতেই হবে। সমারোহ করার দিন আর তাদের নেই। মাথার উপর পর্বতপ্রমাণ দেনা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এখনও যদি হিসাব ক'রে তারা চলতে না পারে, তাহ'লে যা আছে, তাও রাখা যাবে না। এই 'দেবধাম', এই বিখ্যাত ঘোষ-পরিবার,—দেখতে দেখতে এর চিহ্নও থাকবে না।

শঙ্কর স্থির করলে, তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যত দিকে সম্ভব খরচ কমাতে হবে। বাইরের চাল যা নিতান্ত না রাখলে নয়, তাই মাত্র রাখা হবে। হিমাংশুবাবুর দুঃখ হবে, অনেক অসুবিধা এবং কষ্টও হবে। কিন্তু এ অবস্থায় শক্ত না হ'লে উপায় কি?

দাসী-চাকর কয়েকজনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল ; অন্দরের জন্ত রইল শুধু একজন ঝি। আর সদরে রইলো হিমাংশুবাবুর খাস চাকর রমুয়া। রমুয়াকে ছাড়ালে তাঁর একটা মিনিট চলে না। এতে টাকার দিক দিয়া যে খুব বেশি সুবিধা হ'ল তা হয়তো নয়। ক'টা টাকাই বা ওরা মাইনে পেতো ? সুবিধা হ'ল চালের। চাল সংগ্রহ করা সম্প্রতি খুবই কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্য কথা বলতে গেলে, ওদের নিজেদের পরিবার নিতান্তই ছোট। কর্তা, গিন্নী আর শঙ্কর। বাড়ী সরগরম থাকতো চাকর-বাকরেই। তাদের প্রায় সবগুলো চ'লে যাওয়াতে বাড়ী একেবারে খালি হয়ে পড়লো। নিস্তব্ধ, নিঝুম। গিন্নী মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন। মনকে সান্ত্বনা দেন, দু'দিন পরে সয়ে যাবে।

ঠাকুরটাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা ছিল। লোকজন নেই কি হবে শুধু শুধু ঠাকুর রেখে।

কিন্তু এইখানটায়·বড়বাবু বেঁকে দাঁড়ালেন।

গিন্নী বললেন, ক'জনই বা লোক! এমন বুড়ো-হাবড়াও হইনি। এই ক'জনের রান্না আমি খুব পারব।

বড়বাবু কঠোরকণ্ঠে বললেন, না।

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের গুরুত্ব যে কতখানি, গিন্নী তা জানতেন। সুতরাং ঠাকুরকে সরাতে সাহস করলেন না।

ভাবলেন, থাক। মেয়ের বাড়ী যাওয়া, খবরাখবর নেওয়া, ঠাকুর ছাড়া কেউ পারবে না। থাক ও।

রয়ে গেল বাইরের দরওয়ানটাও।

এই অবস্থায় একদিন হঠাৎ শ্রীমন্ত এসে উপস্থিত। এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে এ বাড়ীতে এই তার প্রথম পদার্পণ।

দেউড়ির দরওয়ান ম্লান হাস্তে তাকে সংবর্ধনা করলে।

বললে, ভিতরে চলে যান। সদরের বালাখানা বন্ধ।

শ্রীমন্ত উপরের দিকে চেয়ে দেখলে, বন্ধই বটে। চারিদিক কেমন শ্রীহীন বোধ হতে লাগলো। বাড়ী ঢোকবার গোল রাস্তার দুপাশে জঙ্গল হচ্ছে। গাড়ীবারান্দার এক কোণে কতকগুলো ময়লা জমেছে। ফোয়ারাটা দিয়ে আর জল পড়ে না। সেই সখের লাল-নীল মাছগুলোও আর নেই। নেই সেই কলরব, ছুটোছুটি এবং চঞ্চল সজীবতা।

উপরে উঠে শ্রীমন্ত প্রথমে তার নিজের পুরোনো ঘরটির দিকে উঁকি দিলে।

দেখলে সেই ঘরে মেঝেয় ফরাস বিছিয়ে বড়বাবু গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে একখানা খবরের কাগজ পড়ছেন।

শ্রীমন্ত গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

হিমাংশুবাবু বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বললেন, শ্রীমন্ত! অনেক দিন পরে এলে বলে মনে হচ্ছে যেন।

শ্রীমন্ত উত্তর দিলে না। দেখলে, বড়বাবুর শরীর অনেকখানি কাহিল হয়ে গেছে। সেই গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বরও যেন দুর্বল।

জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কি অসুখ ক'রেছিল?

—না তো।

—শঙ্কর এরা সব কোথায়?

—ভেতরে, ভেতরে। চ'লে যাও। তোমার আর সঙ্কোচ কি?

শ্রীমন্তর বুক একবার দ্রুততালে নেচে উঠলো: হৈমন্তী কি আছে?

ভিতরের প্রশস্ত দরদালানে গৃহিণী তরকারি কুটছিলেন। শ্রীমন্তকে দেখে লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি বঁটিটা বন্ধ ক'রে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলেন।

—ওমা, শ্রীমন্ত! বুড়ো বাপ-মাকে এতদিনে মনে পড়লো? এসো, এসো।

শ্রীমন্ত হেঁট হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মেঝেতেই বসে পড়লো।

—ওকি, ওকি! দাঁড়াও, একখানা আসন এনে দিক। অ কদম।

—কিচ্ছু দরকার নেই মা। এই বেশ বসেছি। কেমন আছেন বলুন? শরীর তো ভালো দেখাচ্ছে না!

কেমন থাকার কথায় গৃহিণীর বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার ক'রে উঠলো। চোখ জ্বালা করতে লাগলো।

তবু হেসে বললেন, আমাদের আর থাকা-থাকি বাবা! বয়স হচ্ছে, এখন তোমাদের রেখে ভালোয়-ভালোয় যেতে পারলেই বাঁচি। তুমি কেমন আছ?

ব'লে শ্রীমন্তর দিকে চাইলেন।

পরনে তার কোঁচানো দিশী ধুতি। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবিতে ঝলমল করছে হীরার বোতাম। আঙ্গুলে দামী-দামী কয়েকটা আংটি। এতগুলো আংটি এক সঙ্গে সে বড়-একটা পরে না। আজকে কেন পরেছে, কে জানে?

গিন্নী হেসে বললেন, যাই বল বাছা, তোমার সেই লাবণ্য যেন নেই। বড্ড কি বেশী খাটতে হয়?

—ঠিক ধরেছেন মা! মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

শ্রীমন্ত হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

গৃহিণীর স্নেহের পরিচয় শ্রীমন্ত বরাবরই পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই শান্ত অথচ রাশভারী মহিলার এত কাছে ব'সে এমন জোরে হাসতে শ্রীমন্ত এর আগে কখনও সাহস করেনি। ব্যাপারটা এমনই অভিনব যে, ঘোষ-গৃহিণীর চোখে পর্যন্ত বিস্ময় ফুটে উঠলো।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই শ্রীমন্ত বলতে লাগলো ঃ

—খাওয়ার যে কি কষ্ট সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। ঠাকুরটা বোমা পড়ামাত্র পালিয়েছে, সেই সঙ্গে চাকরটাও। তার বদলে যে 'চাকরটা পেয়েছি, সে বদ্ধ কালা। ঝোল রাঁধতে বললে ভাজা করে, ডাল বললে টক। আর সে কী রান্না!

—তাহ'লে তুমি এইখানেই আজ খেয়ে যাবে বাছা! সেইজন্যে শরীর অমন হয়েছে। অ কদম!

শ্রীমন্ত হাত জোড় ক'রে বললে, আজ থাক মা। আজকে অনেক ঝামেলা, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। আর একদিন এসে প্রসাদ পেয়ে যাব।

গৃহিণী হেসে বললেন, আর একদিনও আসবে বাবা। আজকেও খেয়ে যেতে হবে। অ কদম!

শ্রীমন্ত বুঝলে, এর পরে বাধা দেওয়া নিরর্থক।

এমন সময় ধীরে ধীরে হিমাংশুবাবু এসে ওদের কাছে দাঁড়ালেন।

গায়ে একখানা সিল্কের কল্কাদার কিমোনো, পরনে পায়জামা। মুখে চুরুট। ডান হাতে একখানা 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'।

হিমাংশুবাবুর শরীর যে কত খারাপ হয়ে গেছে, শ্রীমন্ত এতক্ষণে পরিপূর্ণভাবে টের পেলে। এই দু'বৎসরেই ভদ্রলোক বেশ খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছেন। ডান হাতের খবরের কাগজখানা অনবরত কাঁপছে। দুই হাতেরই বোধ হয় এই অবস্থা। স্খলিত চরণ, জড়িত কণ্ঠ।

এই কিমোনোটা শ্রীমন্তের অপরিচিত নয়। অনেক দিন থেকে দেখে আসছে। মাঝে মাঝে ফুটো হয়ে গেছে। বাইয়ের ছোট

ঘরটিতে যখন তিনি ব'সেছিলেন, এটা গায়ে ছিল না। এখন শ্রীমন্তর কাছে কেন যে প'রে এলেন, কে বলবে? দারিদ্র্যের লজ্জা ঢাকবার জন্যে? কে জানে!

বললেন, যুদ্ধের খবর কি হে?

রঘুয়া তাড়াতাড়ি একটা কুশন-চেয়ার এনে দিলে। শ্রীমন্তর কাছে তিনি সেইটেতে বসলেন।

শ্রীমন্ত যুদ্ধের খবর খুব বেশি রাখে না। তবু বললে, খুব ভালো ব'লে মনে হচ্ছে না।

উত্তেজিতভাবে হিমাংশুবাবু বললেন, নয়ই তো। সেদিন সলোমন আইল্যাণ্ড্সের কাছে আকাশে আর সমুদ্রে যে বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেল, তার ফলাফল কিছু জানো?

ফলাফল দূরের কথা, যুদ্ধের খবরটাই সে এই প্রথম শুনলে। কিন্তু ভূগোলের সব এখনও সে ভুলে যায়নি। বুঝলে, যুদ্ধটা ঘটেছে জাপানে আর আমেরিকায়।

সুতরাং তৎক্ষণাৎ সহাস্যে বললে, ফলাফল তো বোঝাই যাচ্ছে। ও কি আর বলবার?

—এই! আমিও সেই কথাই বলছিলাম। ফল যা হয়েছে তা জানাই, কি বলো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিমাংশুবাবু চেয়ারটা শ্রীমন্তের কাছে আর একটু সরিয়ে এনে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন, আচ্ছা, জাপানীরা কি শিগগির ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে ব'লে মনে হয়?

—সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? এরা তো বাঙলা দেশ ছেড়ে দেবার জন্যে তৈরি হয়েই বসে আছে।

হিমাংশুবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর বাহুতে কপালে নীল শিরা স্ফীত হয়ে উঠলো।

বললেন, যাক, যাক! সব ধ্বংস হয়ে যাক, পাপে এই শহর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার যদি এইখানেই শহর পত্তন করতে হয়, তাহ'লে এর এক হাত মাটি তুলে ফেলতে হবে। এর মাটির নীচে পর্যন্ত বিষ ঢুকেছে, জানো শ্রীমন্ত, মাটির নীচে পর্যন্ত!

হিমাংশুবাবু ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে চলে গেলেন। শ্রীমন্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। এই শান্ত নির্বিরোধ মানুষটির মনে এমন ভূমিকম্পের উত্তাপ জমলো কি ক'রে?

কার উপর ক্রোধ?

শ্রীমন্ত জানে, ঘোষবংশের আভিজাত্যের এই শেষ প্রতীক এখনও বৃটিশ শাসনের অনুরাগী। তবে? কার বিরুদ্ধে, কিসের বিরুদ্ধে ওঁর জীর্ণ মনে এই উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছে? কে জানে! কে জানে!

শঙ্কর আর শ্রীমন্ত এক সঙ্গে দোতলার দরদালানে খেতে বসলো অনেককাল পরে।

গৃহিণী সামনে বসে খাওয়াতে লাগলেন।

শ্রীমন্তের উপর গৃহিণীর অনুগ্রহ বরাবরকার। কিন্তু আজকের আয়োজনে যেন একটু বিশেষত্ব আছে। এ যেন একটা সম্মান এবং তার জীবনে এ সম্মান এই প্রথম।

গৃহিণী বললেন. তুমি বাড়ীর লোক, তাই খেতে বললাম। নইলে, যা চাল, বাইরের লোককে আর খেতে বলা যায় না।

হেসে বললেন, জামাই এলে দিনের বেলাতেও লুচি দিই। লজ্জায় সুবিমল দিনে আসে না।

ভাতের দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, বড়বাবুও কি এই চালের ভাত খান?

—তাঁর ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। এ ভাত খেতে পারেন না, একটু নাড়াচাড়া ক'রে উঠে পড়েন।

শঙ্করের দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত বললে, তুমি আমাকে বলোনি কেন?

সবিস্ময়ে শঙ্কর বললে, তুমি ভালো চাল দিতে পারতে?

—এখনও পারি। তা তোমাকে আর যেতে হবে না, আমিই বরং একদিন মণ দুই ভালো চাল দিয়ে যাব। কিন্তু…

শঙ্করের ভাতের গ্রাস মধ্যপথেই থেমে গেল।

বললে, কিন্তু কি ?

শ্রীমন্ত একটু ভেবে বললে, কাল সোমবার। কাল রাত একটার সময় চাল নিয়ে আসব। দরোয়ানকে গেট খুলে জেগে থাকতে বলবে।

শঙ্কর হেসে বললে, দরোয়ান কেন শ্রীমন্তদা, আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই সারারাত গেটের গোড়ায় ব'সে থাকতে পারি,—এমনি অবস্থা হয়েছে।

গৃহিণী বললেন, হাসির কথা নয় বাবা, সত্যি তেমনি অবস্থা হয়েছে। বিশেষ, ওঁর শরীরের জন্যে আমাদের সবারই ভয় হয়েছে। কিন্তু অত রাত্রে চাল আনবে কেন বাবা? একটু সময় ক'রে দিনের বেলায় আনতে পারো না? বলো যদি…

শ্রীমন্ত হেসে বললে, সময়ের জন্যে নয় মা। সে আছে অনেক ব্যাপার, শঙ্কর বুঝেছে। কিন্তু বাবুর শরীরের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে মা। শরীরটা ওঁর একেবারেই ভেঙে গেছে।

—শুধু শরীর?—গৃহিণীর মুখের উপর একটা কালো ছায়া নামলো।

শঙ্কর বললে, কিছুদিন থেকে বাবার মাথার অবস্থাও খুব ভালো বোধ হচ্ছে না।

গৃহিণী বললেন, ওই শুনলে না তখন? সব ধ্বংস হয়ে যাক, এই হয়েছে ওঁর বুলি।

বিচিত্র কিছুই নয়। আজীবন মদ্যপান করে এসেছেন। দেহ ব্যাধিমন্দিরে পরিণত হয়েছে। তার উপর অর্থসঙ্কট এবং এই চারিদিকের ডামাডোল। শ্রীমন্ত ভাবলে, ঋণগ্রস্ত প্রাচীন জমিদারবংশের এছাড়া আর কি পরিণতি প্রত্যাশা করা যায়?

সে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগলো।

একটু পরে মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলে, হৈমন্তীর খবর কি মা? ভালো আছে তো?

গৃহিণী বললেন, এখন পর্যন্ত ভালই আছে। আশ্বিন মাসে ছেলে হবে বলে দিন পোনেরো হ'ল এখানেই এনেছি। এখন ভালোয় ভালোয় যাদের ছেলে-বৌ তাদের কাছে ফিরে পাঠাতে পারলে বাঁচি।

শ্রীমন্তর কানের ভিতরে হঠাৎ যেন সহস্র ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলে....

হৈমন্তীর আশ্বিন মাসে ছেলে হবে?....এই বাড়ীতেই আছে?.... অথচ এর মধ্যে একবারের জন্যেও এসে তার সঙ্গে দেখা ক'রে গেল না?....এও সম্ভব?....এও সম্ভব!

শ্রীমন্তর গলার ভিতরটা যেন শুকিয়ে গেল। ভাতের গ্রাস গলা দিয়ে নামতে চাইলো না। এটা-ওটা নাড়াচাড়া ক'রে সে উঠে পড়লো।

—তোমার যে কিছুই খাওয়া হ'ল না বাবা ?

শ্রীমন্ত ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। গৃহিণীর কথায় এক গাল হেসে বললে, কী যে বলেন মা! আজ যা খেলাম, এ আমার অনেক দিন মনে থাকবে।

[ ১৪ ]

সন্ধ্যার পরে শ্রীমন্তর বাড়ীতে এসে সুমিত্রা শুনলে, বাবু সেই যে সকালে বেরিয়ে গেছেন—এখনও ফেরেন নি।

এতে অবাক হবার কিছু নেই। শ্রীমন্তর সঙ্গে তার যতদিনের চেনা, তাকে সে এইরকমই দেখছে। সে যে কি করে, আর কি না করে সুমিত্রা আজও তার হদিস পেলে না। কিন্তু কিছুদিন থেকে এইটে সে নিঃসংশয়ে বুঝেছে, শ্রীমন্ত প্রচুর রোজগার করছে। আমীরের মতো দরাজ হাতে সে খরচ করে এবং টাকাও বোধকরি ভালোই জমিয়েছে। এত টাকা সে কি ক'রে কোথা থেকে পাচ্ছে, তা সে জানে না। কিন্তু সদুপায়ে যে নয়—তা' বুঝতে পারে এবং যথাসম্ভব তাকে দোহনও করে।

সুমিত্রাও বেরিয়েছিল দুপুর বেলায়। হেনরির সঙ্গে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে লাঞ্চ সেরে ওরই সঙ্গে গিয়েছিল মেট্রোয় সিনেমা দেখতে।

ছ'টায় সেখান থেকে বেরিয়ে ক্যাসানোভায় চা খেয়েছে সাতটা পর্যন্ত।

সেখান থেকে হেনরি চলে গেছে ডিউটিতে, আর ও এসেছে শ্রীমন্তর খবর নিতে। কিন্তু শ্রীমন্ত সেই যে সকালে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি।

হয়তো ফিরবে এখনই। সুমিত্রা একটু অপেক্ষা করতে পারে। হাতে এখন তার কোনোই কাজ নেই।

রাস্তার দিকের বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার টেনে ও বসলো।

কালা চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করে গেল, চা দিয়ে যাবে কি না। তাকে 'না' বলে দিয়ে সুমিত্রা একটা সিগারেট ধরালে। হেনরির সঙ্গে ঘোরবার সময় মাঝে মাঝে এক-আধটা সিগারেট আজকাল সে খাচ্ছে। কিন্তু গোপনে।

সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে ও শ্রীমন্তর কথা ভাবতে লাগলো।

অনেক ছেলে সে দেখেছে, কিন্তু এমন আশ্চর্য ছেলে এর আগে কখনও তার চোখে পড়েনি। ওর দেহে যেমন শক্তি, মনেও তেমনি মত্ততা। কিন্তু সে মত্ততা নির্বিকার,—সমুদ্রের তরঙ্গের মতো যেন একটা রুটিন মেনে চলেছে। ওর ছোট ছোট দুই চোখের ফাঁক দিয়ে যেন দুখানা ভোজালির প্রান্ত চক্‌চক্ করছে। ওর সঙ্গের একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণের উৎস কোথায়, বোঝা যায় না। ওর কথা ভাবতে সুমিত্রার অবাক লাগে।

হেনরির একটা শক্তি আছে। হাউইএর মতো সুমিত্রাকে সে প্রচণ্ডবেগে অকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে নিজে ফুরিয়ে যায়। মৃৎপিণ্ডের মতো সুমিত্রা তখন মাটিতে এসে পড়ে।

আর শ্রীমন্ত যেন লোনা জলের দুরবগাহ সমুদ্র। সে জল খাওয়া যায় না। সেখানে নামতেও ভয় করে। কিন্তু একবার যে নেমেছে, সে ভয়ঙ্কর খেলার নেশায় মেতে উঠবে।

তেমনি নেশা লেগেছে সুমিত্রার। এই আশ্চর্য ভয়ঙ্কর মানুষটির উপর।

হঠাৎ সিঁড়িতে শ্রীমন্তর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সুমিত্রা

তাড়াতাড়ি হাতের সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্বিকার বসে রইলো বাহিরের আকাশের দিকে চেয়ে।

শ্রীমন্ত ওর দিকে চেয়েই অট্টহাস্য করে উঠলো :

—সুমিত্রা যে! কতক্ষণ?

—এই আধ ঘণ্টাটাক। কোথায় বেরিয়েছিলে, সেই সকাল থেকে?

ওর পাশে একখানা চেয়ার টেনে বসে শ্রীমন্ত বললে, বহু জায়গায়। সর্বশেষে তোমার বাড়ী।

—আমার বাড়ী?

—হ্যাঁ সখি! গিয়ে শুনলাম, দুপুরেই তুমি বেরিয়েছ, কোথায় নাকি লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে।

ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, কার নিমন্ত্রণ সখি! হেনরির?

ওর মুখ দিয়ে ভক ভক ক'রে উগ্র মদের গন্ধ বেরুচ্ছে!

হেনরিকে নিয়ে এই শ্রেণীর রসিকতা শ্রীমন্ত কখনও করেনি।

সুমিত্রা লাফিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো :

—তুমি মদ খেয়েছ?

সে চীৎকারে শ্রীমন্ত চমকে চেয়ার নিয়ে পিছিয়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো :

—মদ? হ্যাঁ, খেয়েছি। বেশী নয় একটখানি। আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে সুমিত্রা। আজকে তুমি তিরস্কার কোরো না। চুপ করে একটুখানি আমার কাছে বোসো। হ্যাঁ, that's like a good girl!

সুমিত্রা বসলো, কিন্তু কাছে নয়, একটুখানি দূরে। ওর বিস্ময় লাগছিল, সেই সঙ্গে আমোদও। ওকে এমন দুর্বল, এমন অসতর্ক এবং

অসহায় আর কখনও সে দেখেনি। আটলান্টিক সমুদ্রে কে যেন এক রাশ তেল ঢেলে দিয়েছে। আর সমস্ত তরঙ্গ গেছে থেমে। সমুদ্র যেন বীর্যহীন, নিস্তরঙ্গ পুকুরে পরিণত হয়েছে!

শ্রীমন্ত বললে, তুমি কখনও কাউকে ভালোবেসেছ সুমিত্রা?

অন্য সময় শ্রীমন্তের মুখ থেকে এই কথা শুনলে ও অপমানিত বোধ করতো, রেগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতো। কিন্তু শ্রীমন্তের অবস্থা দেখে এ প্রশ্নে ও রাগলে না। বরং হেসেই ফেললে। বললে, কি জানি?

—ঠিক। জানো না। আমিও জানতাম না। দুপুর রাত্রে বিশ হাজার টাকার গহনা গায়ে দিয়ে হৈমন্তী আমাকে সেধেছে। কিন্তু টলাতে পারেনি। সেই মেয়ে আজ আমার সঙ্গে দেখা করলে না, এই কথাটা ভাবছি আর আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কেন বলো দেখি? আমি কি তাকে ভালোবেসেছিলাম!

—তুমি কাউকে ভালোবাসতে পারো, এ আমার বিশ্বাস হয় না।

—আমারও হয় না। কিন্তু বুক যে জ্বালা করছে সুমিত্রা, এ তো অবিশ্বাস করবার ব্যাপার নয়।

হঠাৎ সুমিত্রার চোখ জ্বালা করে উঠলো। বললে, তোমার বুকে আগুন জ্বালাতে পারে, এমন মেয়ে আমি কল্পনাও করতে পারি না। তোমার হৃদয় নেই, এই আমার বিশ্বাস।

—সেই দৃঢ়বিশ্বাস আমারও ছিল সুমিত্রা। আমার বিশ্বাস টলেছে এবং আশঙ্কা হচ্ছে, তোমারও টলবে। অনুমতি কর সুমিত্রা, আর একটুখানি খাই? খুব সামান্য একটুখানি?

শ্রীমন্ত বাঁ পকেট থেকে একটা ফ্লাস্ক্ বের করলে।

সুমিত্রা যেন ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, না।

—একটি ফোঁটা। Please.

সুমিত্রা তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে বললে, একটি ফোঁটাও না। ওঠ, শোবে চলো।

এক রকম জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে সুমিত্রা ওকে খাটের উপর শুইয়ে দিলে।

বললে, একটু ঘুমোও দেখি?

অত্যন্ত দুষ্ট ছেলের মতো মিট মিট করে হেসে শ্রীমন্ত বললে, না।

ধমক দিয়ে সুমিত্রা বললে, না কেন?

—হয় আমাকে একটি ফোঁটা মদ দাও, Please,—নয় তুমি বলো আজ রাত্রে এখানে থেকে যাবে। আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। মাইরি!

সুমিত্রা হেসে ফেললে। বললে, আচ্ছা, থাকব। তুমি ঘুমোও।

—সত্যি? শ্রীমন্ত ধড়মড় করে উঠে বসলো। ও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—সত্যি।

সুমিত্রা ওকে খাটের উপর শুইয়ে একখানা ইজিচেয়ার ওর খাটের কাছে টেনে নিয়ে এল। টেবিল ল্যাম্পের ঢাকাটা টেনে দিয়ে ওর চোখের দিকটা অন্ধকার করে দিলে। পাখাটা দিলে খুলে। তারপরে ওর একখানি হাত বুকের উপর টেনে নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লো।

বললে, আমি এইখানে রইলাম। দুষ্টুমি না করে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ো দিকি?

শ্রীমন্তর বোধকরি তন্দ্রা আসছিল। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু সুমিত্রা জেগে রইলো অনেকক্ষণ। ক্ষুধা ছিল না।

শুধু একটুখানি কফি খেলে। তারপরে সেই ইজিচেয়ারে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। এই অসহায় নিদ্রিত মাতাল তার নিদ্রাহীন চোখে যেন পদ্ম মধুর অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে। এত সুখের রাত্রি তার জীবনে এর আগে আর আসেনি। সারা রাত সে জেগে কাটালে।

ভোরের দিকে কখন এক সময় সুমিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছিল। পূবের জানালা দিয়ে আলো এসে তার চোখে পড়তে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে দেখে খাটে শুয়ে-শুয়েই শ্রীমন্ত এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে!

ভোজালির মতো কঠিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখনও ওর চোখে জাগেনি। দৃষ্টি এখনও অলস, শ্রান্ত,—ভোর-হয়ে-আসা আকাশের শুকতারার মতো একটু যেন করুণও।

তাড়াতাড়ি বেশ-বাস সংযত করে সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালো। অপাঙ্গে ওর দিকে চেয়ে একটু হেসে বাথরুমে চলে গেল।

ফিরে এসে দেখে শ্রীমন্ত তখনও অলস ভাবে চোখ বুজে শুয়ে।

ওর পায়ের শব্দে চোখ মেলে শ্রীমন্ত বললে, নীচে চাকরটার ঘোরাফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন। ওকে একটু গরম জলে লেবুর রস দিয়ে নিয়ে আসতে বলবে সুমিত্রা? না হলে বোধহয় উঠতে পারবো না। সেই সঙ্গে চা'ও।

শ্রীমন্ত ম্লান ভাবে হাসলে।

সুমিত্রা চাকরকে গরম লেবুজল আর চা'য়ের জন্যে বলে এসে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিলে।

শ্রীমন্ত বললে, কাল রাত্রে তোমাকে আটকানো আমার ঠিক হয়নি সুমিত্রা। ভয় হচ্ছে, তোমার বাবা-মা হয়তো রাগ করবেন।

সহজ কণ্ঠে সুমিত্রা বললে, রাগ করবেন কেন? নিজের ভালো-মন্দ বোঝবার বয়স আমার হয়েছে। তাঁরা এতে কিছু মনে করবেন না।

কালা চাকর লেবু, গরম জল, চা দুধ চিনি রেখে গেল। সুমিত্রা তৈরী করতে বসলো।

শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এখানে আসবে, না তোমার লেবু-জল বিছানার কাছে দিয়ে আসব?

হেসে শ্রীমন্ত বললে, চায়ের গন্ধে শরীরে একটু একটু করে যেন শক্তি ফিরে আসছে। উঠতে পারব মনে হচ্ছে।

চায়ের টেবিলে বসে বললে, তোমার মুখে ভোরের আলো এসে পড়েছে সুমিত্রা। সোনালি আলো। শরতের আর বোধ হয় দেরী নেই বেশী।

সুমিত্রা জবাব দিলে না। মুখ নীচু করে হাসতে হাসতে চা তৈরী করতে লাগলো। এক পেয়ালা চা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দেখতো, চিনি আর লাগবে কি না।

চুমুক দেবার আগেই শ্রীমন্ত বললে, বোধ হয় না। তোমার হাত এমনিতেই যথেষ্ট মিষ্টি।

সুমিত্রা হেসে ফেললে। বললে, তোমার কি হয়েছে বলো তো?

কী জানি! মুখ দিয়ে ক্রমাগত ভালো ভালো কথা বেরুচ্ছে। এমন তো বড় একটা হয় না! আমার বিশ্বাস, এ একটা ব্যাধি। আশা করছি, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে।

—Amen. তোমার বুকের সেই যন্ত্রণাটা আর নেই তো?

কাল রাত্রের সব কথা শ্রীমন্তর পরিষ্কার মনে পড়ছে না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিসের যন্ত্রণা?

চায়ের পেয়ালার আড়ালে ঈষৎ হেসে সুমিত্রা বললে, সে আমি কি জানি? তুমিই বলছিলে তাই জিজ্ঞেস করলাম।

শ্রীমন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, হৈমন্তী কে?

—তার নাম তুমি কোথায় শুনলে?—শ্রীমন্ত প্রায় চীৎকার করে উঠলো।

—শুনেছি। তাকে একবার দেখাতে পারো?

—কেন বলোতো?

—বুক পোড়ানোর মন্তরটা শিখে আসব।—সুমিত্রা টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

একটুক্ষণ স্তব্ধভাবে কাকে যেন শ্রীমন্ত ভেবে নিলে। বোধকরি হৈমন্তীকেই।

তারপর বললে, তাতে কাজ নেই সুমিত্রা। ও মন্তরটা ভালো নয়। তার চেয়ে আমি বলি কি........

শ্রীমন্ত থামলে।

সুমিত্রা চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলেছিল, আবার নামালে। বললে, কী বলো?

—আমি বলি, এসো আমরা বিয়ে করে ফেলি।

সুমিত্রার হাতের পেয়ালাটা প্লেটের উপর ঠক করে একবার কেঁপে উঠলো।

শ্রীমন্ত বলতে লাগলো, এ মাসটা বোধ হয় ভাদ্র মাস। তা হোক, আমাদের বিয়ে হবে তিন আইনে। কি বল?

সুমিত্রা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। কী বলে শ্রীমন্ত? ও কি পরিহাস করছে? ওর কথা ও যেন বুঝতে পারছে না।

শ্রীমন্ত আপন মনেই বলে চলেছে :

—আমার বিশ্বাস, এ ভালোই হবে। আমরা পরস্পরকে চিনি। কারও সম্বন্ধেই কারও কোনো মিথ্যে আশা, কি মিথ্যে বিশ্বাস নেই। আমরা কেউ কারও উপর জবরদস্তি করব না। ভুল-ভাঙ্গারও কোন প্রশ্ন উঠবে না। বিনা দাবী-দাওয়ায় আমরা ঘর বাঁধব,—যাকে বলে সংসার। ইচ্ছে করলে তুমি চাকরী করতে পারো। ইচ্ছে করলে নাও করতে পারো। যে টাকা আমার জমেছে, সে নিতান্ত সামান্য নয়। কি বলো, আমি কি মন্দ প্রস্তাব করেছি?

শ্রীমন্ত হয়ত আরও কিছু বলতো, কিন্তু সুমিত্রা হঠাৎ সজোরে হেসে উঠলো। হাতের ঘড়িটা ওর নাকের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ক'টা বাজছে খেয়াল আছে মশাই? সাড়ে আটটা। দশটায় অফিস না? আমি চললাম।

—ওঃ তাই নাকি! কী সর্বনাশ! শ্রীমন্ত লাফিয়ে উঠে বাথরুমে চলে গেল।

সমস্ত পর্বটাই যেন একটা অভিনয়!

[ ১৫ ]

সমস্ত দিন শ্রীমন্তের মন কেমন উড়ু উড়ু করতে লাগলো। কাজে মন বসে না কিছুতেই।

দু'মণ উৎকৃষ্ট মিহি চালের ব্যবস্থা সে করেছে। একটু বেশি রাত্রে নিয়ে যেতে পারলেই ভালো হয়। পুলিশের ধরবার ভয় থাকে না। কিন্তু অত রাত্রি পর্যন্ত তার সবুর সইলো না। একটু ঝুঁকি নিয়ে রাত্রি

সাড়ে নটার মধ্যেই সে একখানা ট্যাক্সি করে বেরিয়ে পড়লো। 'দেবধামের' একেবারে গাড়ীবারান্দার নীচে গিয়ে ট্যাক্সি থামলো কর্কশ শব্দে।

সেই শব্দে একগাল হেসে শঙ্কর বেড়িয়ে এলো।

—এনেছ শ্রীমন্তদা ?

—হুঁ। একজন কাউকে বলো বস্তাটা ভিতরে নিয়ে যেতে। খবর সব ভালো তো ?

সেই ট্যাক্সিতেই শ্রীমন্ত চড়তে যাচ্ছিল। অনুনয়ের সুরে শঙ্কর বললে, একটু চা খেয়ে যাবে না শ্রীমন্তদা ?

—চা ?—শ্রীমন্ত একটু কি যেন ভাবলে। বললে, আচ্ছা।

ট্যাক্সি ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে সে ভিতরে গেল শঙ্করের সঙ্গে। দোতলায় উঠে ওর আগেকার ঘরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে, ভিতর থেকে শব্দ এলো, কে ও ?

হিমাংশুবাবুর কণ্ঠস্বর। কিন্তু কালকের মতো ক্ষীণ নয়।

শঙ্কর নিষেধ করবার আগেই শ্রীমন্ত সবিনয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে আমি।

ব'লে দরজা থেকে উঁকি দিতেই হিমাংশুবাবুর চোখে চোখ পড়ে গেল। বড়বাবু একাই তখন ফ্ল্যাস্কে, ডিকেণ্টারে, গ্লাসে, প্লেটে আসর সাজিয়ে বসেছেন।

—শ্রীমন্ত ? আরে এসো, এসো।

শ্রীমন্ত না এসে পারলে না।

—বোসো, বোসো। তুমি নাকি খুব বড়লোক হয়েছ ? বেশ, বেশ। শুনে ভারি খুশি হয়েছি। খাবে নাকি একটু ? তাতে কি হয়েছে ? ওসব বাজে সঙ্কোচ আমি পছন্দ করি না। প্রাপ্তে তু ষোড়শে

বর্ষে তোমার বয়স ষোলো বছর তো পেরিয়ে গেছে। খাও ভালো জিনিস। আমরা পুরোনো খদ্দের বলেই পাই। নইলে এখন আর এসব জিনিস পাবার উপায় নেই। বাইরে কে রে?

বাবার কবল থেকে শ্রীমন্তকে বাঁচাবার জন্যে শঙ্কর বাইরে থেকে ইসারা করছিল। কিন্তু হিমাংশুবাবু যেন আটঘাট বন্ধ করে সতর্কভাবে বসে ছিলেন। তাঁর ধমক খেয়ে শঙ্কর পালালো।

হিমাংশুবাবু নিজের হাতে এক পাত্র ওকে ঢেলে দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, যুদ্ধের নতুন কি খবর শুনলে বলো। দেশে নাকি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে? লোক মরছে পথে পথে? সত্যি? বাইরে তো বেরুই না। কেউ আমাকে খবর এনেও দেয় না। আরেকটু খাবে? খাও না। খুব ভালো জিনিষ, নয়? চালের বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা। ও চাল তো খেতে পারি না। জাপানীরা কবে আসবে বলতে পারো? কিছু না হোক, একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বোমাই বৃষ্টি করে যাক না। এ আর ভালো লাগে না!

—এক বস্তা সরু চাল নিয়ে এসেছি আজ।

এতক্ষণ পরে শ্রীমন্ত কথা বললে।

—এনেছ? বেশ, বেশ। এসব এলেম চাই, বুঝলে? চাকর-বাকর কর্মচারীদের ব'লে ব'লে হয়রাণ হয়ে গেছি। ওরা পারে না। অথচ তুমি তো পারলে? বেশ, বেশ। Thank you.

শ্রীমন্তর সঙ্কোচ হচ্ছিল। বাপের চেয়ে বড় হিমাংশুবাবু। এই বাড়ীতে এই বাড়ীর ছেলের মতোই সে মানুষ হয়েছে। সেই বাপের মতো হিমাংশুবাবুর সঙ্গে বসে মদ্যপান। ওর সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠছিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই 'তরল অনলের' মহিমা! দেখতে দেখতে সেই

আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল। রাত্রি বারোটার সময় শঙ্কর উঁকি দিয়ে দেখলে, দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে নৃত্য করছে! আর সে কি হুল্লোড়!

রাত্রিটা শ্রীমন্তকে 'দেবধামেই' থাকতে হোল। একেবারে বেহুঁস হয়ে সে যায়নি বটে, কিন্তু বাড়ী ফেরার মতো অবস্থাও ছিল না। যে ঘরে তার বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে, সেই ঘরেই তার বিছানা হোল।

রঙীন চোখে ঢাকা দেওয়া আলোয় আলো-আঁধারী ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো:

মেঝেয় একখানা লাল মীর্জাপুরী কার্পেট পাতা। তারই উপর ঢাকার ফাঁক দিয়ে বিজলী আলোর একটা বৃত্ত এসে পড়েছে। শ্রীমন্তর মনে হল রক্ত! কার যেন চাপ চাপ তাজা রক্ত ওইখানে পড়ে রয়েছে!

খাটের ওপর সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। মাথা অল্প অল্প ঘুরছে, শরীর দুলছে, চোখ লাল। শ্রীমন্ত স্পষ্ট দেখলে, রক্ত!

কিন্তু কার রক্ত?

হৈমন্তীর?

শ্রীমন্তর মনে পড়লো, সেই দিন, সেই শেষ দিন হৈমন্তী এক-গা গহনা পরে ওইখানটিতেই এসে দাঁড়িয়েছিল না? ও কি তারই বুকের রক্ত? তাজা, টকটকে! এতদিন পরে আজ সেই রক্ত তার চোখে পড়লো?

শ্রীমন্ত বুকে যেন একটা বেদনা অনুভব করলে। তার হৃদপিণ্ডে কে যেন সহস্র ছুঁচ ফোটাচ্ছে। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে।

সে খাটের বাজুতে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলে।

তাতেও নিষ্কৃতি নেই।

চোখ বন্ধ ক'রেও সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, গলিত পীচের মতো জমাট কালো অন্ধকারের ঠিক মাঝখানটিতে একটা চাপ টকটকে লাল রক্ত!

খাটের বাজু থেকে মাথা না তুলেই সে আড়চোখে সম্মোহিতের মতো আলোর বৃত্তটার দিকে চেয়ে রইলো।

কত রক্ত! ওইটুকু বুকে এত রক্ত ছিল!

শ্রীমন্তর চোখে আবার সাপের সেই হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠলো। প্রভাত সূর্যের আভালাগা লাল শিশির বিন্দু যেমন জ্বলতে থাকে, ওর চোখ তেমনি ক'রে জ্বলতে লাগলো।

ওই রক্তের বিষ লেগেছে ওর দেহে। সেই বিষের জ্বালায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওর সমস্ত দেহ যেন পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ও ছটফট করতে লাগলো। আর যেন ও সইতে পারছে না, এক্ষুণি যেন বুক ফেটে যাবে।

হঠাৎ ও উঠে দাঁড়ালো।

এ-বাড়ীর সমস্ত ওর নখদর্পণে। হৈমন্তী কোন ঘরে শোয় সে ও জানে। ও যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তেতলার সেই সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরখানিতে মেহগনির খাটের উপর হৈমন্তী শুয়ে। নিশ্বাসের তালে-তালে ওর বুক দুলছে। মাঝে মাঝে নড়াচড়ায় ওর চুড়ির কিঙ্কিনি, শাড়ীর খসখস শব্দ উঠছে। সেই শব্দ যেন এত দূরেও ওর কানে এসে ওকে অস্থির ক'রে তুলছে।

শ্রীমন্ত উঠলো। ঘরের আলো নিবিয়ে দিল। সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এসে একবার দাঁড়ালো।

আঃ! বাইরের হাওয়া কি ঠাণ্ডা! ওর বুকের ভিতরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

ওদিকের একটা তেতলা বাড়ীর আড়ালে চাঁদ বোধ-করি একটু আগে অস্ত গেছে। পৃথিবীতে অন্ধকার নেমেছে, কিন্তু আকাশের গা থেকে আলোর সমস্ত রেখা এখনও মুছে যায়নি।

সেই অন্ধকারে শ্রীমন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে। কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। দু'হাতে দুদিক ধরে ফ্রাঙ্কেন-ষ্টাইনের মতো টলতে টলতে শ্রীমন্ত চললো হৈমন্তীর ঘরের দিকে।

দ্বার বন্ধ।

শ্রীমন্ত ঠুক ঠুক ক'রে দরজায় টোকা দিলে। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার টোকা দিলে। এবারও কোন সাড়া পেলে না। সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

হৈমন্তীর দরজা কি তার কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে?

শ্রীমন্ত তবু অপেক্ষা করে রইলো। সেই দরজার গোড়ায়। সময়ের বোধ তার লোপ পেয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে। অনন্ত কালের বটপত্রে সে একা রয়েছে জেগে,—হৈমন্তীর জন্যে অপেক্ষা করে।

কিন্তু কবে তার দুয়ার খুলবে কে জানে?

পা টলছে শ্রীমন্তর। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সেইখানে চৌকাঠের গোড়ায় দরজায় মাথা ঠেকিয়ে সে ব'সে পড়লো।

কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ এক সময় দরজা খুলে গেল।

দরজার গোড়ায় অমনিভাবে একজনকে ব'সে থাকতে দেখে হৈমন্তী একটা অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে এল।

শ্রীমন্তর ঘুম আসেনি, তন্দ্রাও না, কেমন একটা আচ্ছন্নের ভাব। হৈমন্তীর অস্ফুট চীৎকারে সে তার ছোট ছোট লাল চোখ মেলে চাইলে।

হৈমন্তী সবিস্ময়ে বললে, তুমি? ওখানে ও রকম করে কেন? কি চাও?

জড়িতকণ্ঠে শ্রীমন্ত কি বললে বোঝা গেল না। ডান হাতখানা সে হৈমন্তীর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

হৈমন্তী নড়লো না। আলোর শিখার মতো নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলো।

কঠিন কণ্ঠে বললে, দাড়োয়ানের চোখ এড়িয়ে এ-বাড়ী ঢুকলে কি করে?

শ্রীমন্ত জড়িতকণ্ঠ যথাসাধ্য পরিষ্কার ক'রে উত্তর দিলে, দাড়োয়ানের চোখ এড়িয়ে নয়। সন্ধ্যার পর থেকে এখানেই আছি।

—কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

—লুকিয়ে নয়,—আমার সেই পুরাণো ঘরে বড়বাবুর কাছে ছিলাম।

—মদ খাচ্ছিলে? আগে তো খেতে না।

—না।

—এখন খাও?

—হুঁ।

হৈমন্তী এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলে। ওর চোখের কঠিন দৃষ্টি করুণায় ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এলো।

বললে তুমি উঠতে পারো?

—পারি।

শ্রীমন্ত চৌকাঠ ধরে উঠে ঘরের মধ্যে একটা পা বাড়ালে।

হৈমন্তী ধমক দিলে: এ-ঘরে নয়। তোমার সেই পুরোণো ঘরে ফিরে যেতে পারো?

শ্রীমন্ত ভয়ে-ভয়ে বললে, দেওয়াল ধ'রে ধ'রে গেলে হয়তো পারি।

—তাই যাও। এখানে অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

শ্রীমন্ত ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। পা কাঁপছে, সমস্ত দেহ টলছে। সে পড়ে যেতে-যেতে বারান্দার রেলিঙ ধ'রে সামলে নিলে।

হৈমন্তী ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেললে। মাতাল দেখে-দেখে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মাতালে তার ভয় করে না। হাসি আসে।

বললে, দাঁড়াও। তুমি পারবে না যেতে। আমি নিয়ে যাচ্ছি ধরে-ধরে।

হৈমন্তী কোমরে বেশ করে আচলটা জড়ালে। তারপর ওর একখানা হাত ধরে বহু কষ্টে ধীরে ধীরে ওর ঘরে নিয়ে গেল। আলোটা জেলে ওকে খাটে শুইয়ে দিলে।

সমস্ত পথ শ্রীমন্ত একটা কথাও বললে না। আচ্ছন্নের মতো খাটে এসে শুইয়ে পড়লো। আলো নিবিয়ে দেবার জন্যে হৈমন্তী সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই শ্রীমন্ত হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে খাটের উপর উঠে বসলো।

হৈমন্তী চমকে উঠলো: কি হ'ল।

শ্রীমন্তর চোখের তারা যেন বেরিয়ে আসছে। কার্পেটের দিকে কম্পিত তর্জনী নির্দেশ করল।

আলোর বৃত্তটার দিকে চেয়ে হৈমন্তী সবিস্ময়ে বললে, কি?

আশ্চর্য অদ্ভুত স্বরে শ্রীমন্ত বললে, ওই দেখ। ওটা কার রক্ত বলতে পারো? তোমার না আমার?

হৈমন্তী নিষ্কম্প আলোর শিখার মতো দেহ পলকের জন্যে একবার

কেঁপেই স্থির হয়ে গেল। একটা ধমক দিয়ে বললে, ও কিছু নয়, শুয়ে পড়।

ধমক খেয়ে শ্রীমন্ত আর একটা কথাও বললে না। শান্ত ছেলের মতো নিঃশব্দে শুয়ে পড়লো। হৈমন্তী একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল।

[ ১৬ ]

শ্রীমন্তের বাইরের দিকের বারান্দায় চায়ের মজলিস বসেছে। আছে সুমিত্রা আর হেনরি।

হেনরি বললে, যুদ্ধের চাকা এবার আমাদের দিকে ঘুরতে সুরু করবে দেখো।

সুমিত্রা বললে, এই কথা তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বলো? কালকেও জার্মাণদের উত্তর ককেসাসে তড়িৎ অভিযানের সাফল্যের খবর পাওয়া গেছে। তারা ভল্‌গা আর ককেসাসের দিকে এগিয়ে চলেছে। দশ দিন আগেও খবর পাওয়া গেছে, সেভিয়েট বাহিনী রষ্টোভ ছেড়ে পালিয়েছে। দু'মাস আগেও জাপানীরা এলিউসিয়ান দ্বীপে নেমেছে, এর মধ্যে চাকা ঘুরে যাবে!

হেনরি হেসে বললে, সুমি, চাকা যে কখন ঘোরে কেউ বলতে পারে না। মুহূর্তের ভুলে যুদ্ধের চাকা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে যায়।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, কিন্তু সেটা তখনই-তখনই বিশ্বাস করা কঠিন হয়।

হেনরি হেসে বললে, কিন্তু তোমাদের কিম্বা আমাদের পক্ষে নয়।

—কেন ?

—আশার কথা মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে। এ যুদ্ধ থেমে গেলে তোমরাও বাঁচো, আমরাও বাঁচি। নয় কি না বলো ?

হেনরি হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত বললে, সে কথা যদি বলো হেনরি, তাহলে শোনো, এ যুদ্ধ থামলে সুমিত্রা কিম্বা আমি বাঁচি না।

হেনরি সবিস্ময়ে বললে, কেন ?

—কারণ, যুদ্ধ থেমে গেলে আমরা বেকার হয়ে যাব। এই যুদ্ধে যারা না খেয়ে মরছে, কিংবা জিনিষপত্রের দাম চ'ড়ে যাওয়ায় যারা অশেষ দুঃখ ভোগ করছে তারা বাঁচবে। কিন্তু আমাদের মতো যাদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাকরী যাবে, কিংবা ঘুসে, ব্ল্যাকমার্কেটে অথবা মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিয়ে যারা আঙুল-ফুলে-কলাগাছ হয়েছে, তারা বাঁচবে একথা মনে করছ কেন ?

—বুঝলাম।—হেনরি হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, ভালো-মন্দ সব নিজের নিজের স্বার্থের দিক দিয়ে, কি বলো ?

—নিশ্চয়।

সুমিত্রা বললে, তোমাদের স্বাধীন দেশ। যুদ্ধ শেষে যে সব সমস্যা তোমাদের দেশে দেখা দেবে, তোমাদের গবর্ণমেণ্ট তার সমাধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। আমাদের তো স্বাধীন দেশ নয়। এখানে সমস্যার সমাধান হয় না। আমরা বড় দুঃখের চাপে ছোট দুঃখকে ভুলতে চেষ্টা করি, এই মাত্র। সৌভাগ্য এই যে, ছোট দুঃখকে ভোলবার জন্যে বড় দুঃখের অভাব কখনও হয় না।

সবাই হাসিলো।

হেনরি বললে, তোমাদের কথা আমি জানতে চাই। একটা প্রশ্নের জবাব দেবে, তোমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানে এত বিরোধ কেন?

সুমিত্রা চট করে বললে, মিথ্যা কথা।

শান্তভাবে শ্রীমন্ত বললে, না সুমিত্রা, একেবারে মিথ্যা নয়। বিরোধ একটু আছে। স্বার্থের বিরোধ।

বিস্ময়ের সঙ্গে হেনরি বললে, দেশের চেয়ে বড় সেই স্বার্থ?

—সেই রকমই দাঁড়িয়েছে! তোমাদের বুঝতে কষ্ট হবে। কি রকম জানো? তোমাদের দেশে আইনসভার আসন যদি ধর্ম হিসাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ত,—যদি শতকরা একটি আসন প্রোটেষ্ট্যাণ্টের, এতটি রোমান ক্যাথলিকের, এতটি ইহুদীর জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ত—তাহ'লে তোমাদের দেশেও ঠিক এই রকম হ'ত। আমেরিকায় এমন একটা ব্যবস্থার কথা তুমি কল্পনা করতে পারো?

হেনরি সভয়ে বললে, সর্বনাশ!

—এদেশে সেই ব্যবস্থাই চলছে। দেশের স্বার্থ যে সব চেয়ে বড়, একথা গোঁড়া সাম্প্রদায়িকও জানে। কিন্তু সম্প্রদায়ের ছোট স্বার্থ সব সময় এমন ক'রে তার চোখের সামনে ঝুলছে যে, তাকে ভোলা অসম্ভব।

হেনরি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

তারপর বললে, তাহ'লে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো?

—একটা জটিল দুষ্টচক্র। স্বাধীনতা পেলেও এর হাত থেকে মুক্ত হতে অনেক সময় নেবে।

হেনরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে আজকে উঠলাম মণ্টি। ডিউটি আছে। তোমাকে কি বাড়ী পৌছে দিয়ে আসতে হবে সুমি?

শ্রীমন্ত ইঙ্গিতে সুমিত্রাকে নিষেধ করলে।

সুমিত্রা বললে, না। ধন্যবাদ।

হেনরি চলে গেল।

হেনরি চলে যাবার পরে ওরা দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। শ্রীমন্ত ওর একখানা হাত নিজের দুই হাতে তুলে নিলে।

বললে, হেনরির সম্বন্ধে আমি যেন ক্রমশঃ 'জেলাস' হচ্ছি সুমিত্রা। এ দুর্বলতা তো ছিল না।

সুমিত্রা হেসে বললে, সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু কি জন্যে আটকালে বলো।

—তোমার কাছে একটা পরামর্শ চাই।

—আমার কাছে? পরামর্শ? তুমি যে ক্রমশঃ হেঁয়ালি হয়ে উঠছ মন্টি!

—সত্যি। পরামর্শ চাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমার গণ্ডীর বাইরে।

—কি রকম ব্যাপার শুনি? বৈষয়িক?

—না। বৈবাহিক।

—সর্বনাশ!

সুমিত্রা ব্যাপারটা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটুক্ষণ দ্বিধা ক'রে শ্রীমন্ত বললে, দেখ সুমিত্রা, অবিলম্বে আমার একটা বিবাহ করা প্রয়োজন।

—তাতে বাধা হচ্ছে কোথায়?

—পাত্রীর।

—বলো কি! বাংলা দেশে পাত্রীর অভাব!

—সকলের নয়, আমার। আমি এমন একটি পাত্রী চাই, যে আমাকে ঘৃণা করবে না। তুমি রাজি হ'লে সব চেয়ে ভালো হ'ত। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমার প্রার্থনা তুমি হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছ!

একটু চিন্তা ক'রে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ আমাকে তোমার এত পছন্দ হ'ল কেন?

—পছন্দ! আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তোমাকে বোধ হয় একটু ভালোবেসেই ফেলেছি!

সুমিত্রা হেসে ফেললে। বললে এরকম দুর্ঘটনা তোমার জীবনে কি এই প্রথম?

—ও প্রশ্ন কোরো না সুমিত্রা। ওর জবাব দিতে পারব না। মানুষ যে তার নিজের মন নিজেও জানে না, এ অভিজ্ঞতা সম্প্রতি আমার হয়েছে।

—কবে থেকে হয়েছে? হৈমন্তীর আগুন যেদিন থেকে তোমার বুকে এসে লেগেছে সেদিন থেকে?

হৈমন্তীর প্রসঙ্গে শ্রীমন্ত কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। বললে, বিচিত্র নয়। কিন্তু তোমাকে যা বললাম, তার কি করছ?

—আমাকে তুমি কিছুই বলোনি তো!

—বললাম না? আমার বিয়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও।

—আমি ব্যবস্থা ক'রে দোব? আমি কি প্রজাপতি অফিস।

সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠলো।

শ্রীমন্ত কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হ'ল না। বললে, না। তুমি প্রজাপতি স্বয়ং। এখন রঙিন ডানা বন্ধ ক'রে আমার একটা ব্যবস্থা করো।

শ্রীমন্ত হাত জোড় করলে।

সুমিত্রা হেসে উঠে ওর বাহুতে একটা মৃদু চপেটাঘাত করলে।

তারপরে গম্ভীরভাবে বললে, পাত্রী একটি আছে,—মিসেস পিঠাবালা। আমাদের সেক্‌শনে কাজ করে। তুমি চেনো বোধ হয়।

—অল্প-অল্প চিনি। পিঠার উপর আমার আকর্ষণও আছে। কিন্তু মিসেস্?

—তাতে কি? ঠিক হয়ে গেছে, ও স্বামীকে ডাইভোর্স করবে।

—না, না। মিসেস্ চলবে না সুমিত্রা। মামলা-মোকদ্দমা……. তারপরে হয়তো এক দল ছেলেপুলে নিয়ে আসবেন। তুমি মিসের খবর দাও।

—মিস্?—চিন্তায় ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুমিত্রা বললে, তাও আছে কতকগুলো। কিন্তু….

—তাদের নাম-ঠিকানা মনে করতে হবে….তারপরে….

—হ্যাঁ। একটু ভাবতে হবে বই কি।

—বেশ তো। তুমি ভাবো, তাদের নাম-ঠিকানা মনে কর। ইতিমধ্যে আমাদের একটা Interim বিবাহ হয়ে যাক। কি বলো?

কথা শেষ করার আগেই সে সুমিত্রাকে বাহুর বন্ধনে বেঁধে ফেললে।

প্রথম ধাক্কায় সুমিত্রা এমনই অভিভূত হয়ে প'ড়েছিল যে একটা কথাও বলতে পারেনি। কোথা থেকে রাজ্যের লজ্জা এসে যেন তার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু সে শক্ত মেয়ে। তার সামলাতে দেরী হ'ল না।

ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে শ্রীমন্তকে বললে, তোমার কথা শুনলাম, এবার আমার কথার জবাব দাও: আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

শ্রীমন্ত উত্তর দিলে, এ সংসারে সবাই নিজের নিজের স্বার্থের চিন্তায়

মগ্ন। কেউ কাউকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। আমার মনে হয়, আমরা যদি পরস্পরকে লাভের অংশ দিই, তাহ'লে স্বার্থের বিরোধ ঘটবে না।

—কিন্তু তাতেই কি পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা জাগে?

—জানি না। না জাগলেই বা কি? সুমিত্রা, আমরা শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রেম নিয়ে ভণ্ডামী করবই না। শুধু একটি জায়গায় খাঁটি থাকবার চেষ্টা করব: আমরা সতর্ক থাকব যেন কিছুতেই কেউ কাউকে ঘৃণা না করি।

—তুমি শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রেমে বিশ্বাস করো না?

—না। আমার মনে হয় কেউই করে না। সবাই বিশ্বাস করার ভান করে।

সুমিত্রা এতদূর যেতে প্রস্তুত নয়। সে দ্বিধা করতে লাগলো।

লক্ষ্য ক'রে শ্রীমন্ত বললে, এত বড় নিষ্ঠুর সত্য তোমার মেনে নিতে কষ্ট হবে। কিন্তু চেয়ে দেখ পশ্চিমের দিকে যেখানে প্রেমের ছড়াছড়ি সব চেয়ে বেশী। ডাইভোর্স কি সেইখানেই বেশী নয়?

—কিন্তু এদেশে?

—এদেশে ডাইভোর্সের ব্যবস্থা নেই বলেই হয় না। লাঠালাঠি, মারামারি, সন্দেহ, অবিশ্বাস ক'রেও একই শয্যায় তারা জীবন কাটায়। আমার কি মনে হয় জানো? জলের মতো মানুষের মনের প্রবণতাও নিচের দিকে। সেই স্বাভাবিক প্রবণতার অভাবই হচ্ছে মহত্ব। ওটা একটা negative virtue. এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলেই পথ-চলা সহজ হয়।

সুমিত্রা তবু দ্বিধা করতে লাগলো।

শ্রীমন্ত ওকে আশ্বাস দিয়ে বললে, তুমি দ্বিধা কোরো না সুমিত্রা। আমি তোমাকে দুদিনে আদিম মানুষে পরিণত করব। আসলে বিবাহ

বলতে আমি কি বুঝি জানো? আপোষ। তোমার স্বার্থ আমি ক্ষুণ্ণ করব না। আমার স্বার্থ তুমি ক্ষুণ্ণ কোরো না। ব্যাস। এরই নাম অনাবিল স্বর্গীয় প্রেম।

—তুমি স্বর্গ মানো?

—মানি। স্বর্গ মানে সেই দেশ যেখানে কেউ কোনো দিন যেতে পারে না।

—কেন পারে না?

—সে দেশ কোথাও নেই ব'লে।

সুমিত্রা হেসে উঠলো। বললে, উত্তম। স্বর্গে যাবার আশঙ্কা যখন তোমার কিংবা আমার কারো নেই, তখন এই পৃথিবীতেই আমরা যথাসাধ্য ভদ্রভাবে বাস করার চেষ্টা করব,—তার মানে কেউ কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করব না। কি বলো?

—হ্যাঁ।

তাহলে তুমি রাজি?

—এত বড় যুক্তির পরে রাজি না হয়ে উপায় কি?

সুমিত্রা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্তও প্রাণ-খুলে হাসতে লাগলো।

[ ১৭ ]

দিন পনেরোর মধ্যে শ্রীমন্ত আর সুমিত্রার বিবাহ হয়ে গেল। সমারোহের সঙ্গে নয়, শান্তভাবে এবং তিন আইন অনুযায়ী। সাবালিকা কন্যার ভালো-মন্দ বোঝবার শক্তির উপর যথেষ্ট আস্থা থাকা সত্ত্বেও তাত্র মাসে তিন আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রি-করা বিবাহে সুমিত্রার বাপ-মা

কেউ উপস্থিত হতে পারলেন না। শ্রীমন্তের বাপ-মায়ের বালাই নেই। উভয়পক্ষের একমাত্র সাক্ষী ক্যাপ্টেন হেনরি আলেকজাণ্ডার।

হেনরী ওকে উপহার দিয়েছে একখানা গোলাপী রঙের বেনারসী এবং ডাকছে 'গোলাপী বন্ধু' বলে। আর শ্রীমন্ত নিজে দিয়েছে জড়োয়া গহনা থেকে আরম্ভ ক'রে, সাবান পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার টাকার জিনিস। মাইনে থেকে সুমিত্রাও কিছু জমিয়েছিল। তাই থেকে শ্রীমন্তকে সে একটা হীরার আংটি দিয়েছে।

বাপ-মা বিয়েতে আসেননি ব'লে সুমিত্রার দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু সে দুঃখ এখন আর নেই। বেশ আনন্দেই সে আছে। এখন তার মনে একমাত্র প্রশ্ন, চাকরী ছেড়ে দেবে কিনা। ঘরে তার মন বসেছে, বাইরের চাকরী আর ভালো লাগে না। বিয়ের পর কোন্ মেয়েরই বা লাগে?

কথাটা একদিন ও শ্রীমন্তকে বললে অপিস থেকে আসবার পথে।

শ্রীমন্ত আজকাল আর অফিস থেকে বেরুতে আগের মতো দেরী করে না। যদি-বা একটু দেরী হয়, সুমিত্রা অপেক্ষা করে। আশ্চর্য এই যে, ওদের বিয়ের খবর অফিসের জনপ্রাণীও জানে না—এমন কি বড়বাবু পর্যন্ত না।

তার ফলে বড়বাবু মাঝে মাঝে শ্রীমন্তর সামনেই সুমিত্রার সঙ্গে রসিকতা করেন। ওরা হাসে, রাগ করে না।

ট্রামে যা ভিড় তাতে শ্রীমন্ত দূরের কথা সুমিত্রা পর্যন্ত কোনো কোনো দিন বসবার জায়গা পায় না। সুতরাং বড় একটা কথা হয় না। একে অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনী, তার উপর ট্রামের এই ভিড়!

সুমিত্রা বিরক্তভাবে বললে, আর ভালো লাগে না চাকরী। মনে করছি, ছেড়ে দোব। তুমি কি বলো?

শ্রীমন্ত বললে যা ট্রামে ভিড়! ভদ্রতা বজায় রেখে মেয়েদের পক্ষে যাওয়া-আসা করাই মুস্কিল।

ওরা বাড়ী এসে গিয়েছিল। হাতের বেঁটে ছাতাটা দুলিয়ে সুমিত্রা বললে, শুধু সেই জন্যেই নয়।

—তবে?

সুমিত্রা একটু রহস্যময় হেসে বললে, দুজনে খেটে-খুটে আসব, আর চাকরে চা দেবে, এইটে আমার ভালো লাগে না।

—কি করতে চাও তার বদলে?

—তার বদলে আমি তোমার জন্যে সেজেগুজে তৈরী হয়ে বসে থাকব। তুমি এলে হাসি দিয়ে তোমায় অভ্যর্থনা করব, নিজের হাতে চা তৈরি করে দোব। সেই ভালো না?

—নিশ্চয়!—শ্রীমন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললে।

সত্য কথা বলতে গেলে, এই বিয়েতে সব চেয়ে লাভ হয়েছে শ্রীমন্তের। শুধু যে বাড়ীর চেহারাই বদলে গেছে তাই নয়, তরকারিগুলোর স্বাদ পর্যন্ত।

একটা ঠাকুর সম্প্রতি পাওয়া গেছে। ভাগ্যের বিষয়, সেটা কালা নয়। কিন্তু রান্না যে শুধু তারই নয়, তাতে সুমিত্রার হাতেরও স্পর্শ আছে, অন্ততঃ সুমিত্রার তত্ত্বাবধান, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

ফলে এই অল্প দিনেই শ্রীমন্তের খাওয়ায়, শোওয়ায়, বেশে আরামের বোধ এসেছে। ও বুঝতে পারে, এই আরামের রসে জারিয়ে সুমিত্রা ওকে ধীরে ধীরে কাবু করে ফেলছে। তবু আরামের লোভ শেষ পর্যন্ত ছাড়তে পারে না। জ্ঞাতসারেই ও মাকড়সার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে। জ্ঞাতসারে এবং স্বেচ্ছায়।

সুমিত্রা চাকরী ছেড়ে দিলে সেই আরাম ওর আরও বাড়বে এই

সম্ভাবনায় পুলকিত হয়ে বললে, তাহ'লে আর দেরি কোরো না। কালকেই এক মাসের নোটিশ দিয়ে দাও।

পরের দিন সকালবেলা হঠাৎ শঙ্কর এসে উপস্থিত।

—শ্রীমন্তদা!

শ্রীমন্ত তখন একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়ছিলো। ওর চেয়ারের হাতলে বসে সুমিত্রা শুনছিলো। শঙ্কর আসতে ধীরে ধীরে উঠে পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলো।

—কি খবর শঙ্কর?—শ্রীমন্ত খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে।

শঙ্কর তখনও হাঁফাচ্ছে। মুখ উত্তেজনায় লাল। বললে, তোমার বাড়ীর সামনে একটা খুন হয়ে গেল।

শ্রীমন্ত এবং সুমিত্রা দুজনে এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো: খুন?

—হ্যাঁ। মোড়ের মাথায় কতকগুলো ছেলে একটা ট্রাম পোড়াচ্ছিল। এমন সময়ে একটা মিলিটারী পেট্রল এসে পড়লো। ছেলেরা যে-যেদিকে পারলে পালালে। মারা পড়লো একটা ফল-ওলা।

শুনে ওরা স্তব্ধ হয়ে গেল।

কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ আটক হওয়ার পর থেকেই এই কাণ্ড চলেছে। ভারতের নানাস্থানে রেলের লাইন তুলে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেলষ্টেশন আর পোষ্টাপিস পুড়িয়ে লোকেরা একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ক'লকাতাতেও খুব গোলযোগ আরম্ভ হয়ে মধ্যে একটা বছর বন্ধ ছিল। আবার কি নতুন ক'রে আরম্ভ হ'ল নাকি?

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এদিকে কি করতে এসেছিলে?

—তোমার কাছেই আসছিলাম। পথে ট্রাম পোড়ানো দেখে ওরই মধ্যে মেতে গিয়েছিলাম।

—সর্বনাশ! খবর্দার, ওর মধ্যে যেও না। মারা পড়বে কোন্ দিন।

সলজ্জভাবে হেসে শঙ্কর বললে, আমাদের পাড়াতেও খুব গোলযোগ চলেছে। আমাদের বাড়ীর সামনে একটা কাঁছনে বোমা ছুঁড়েছিল। আমাদের দারোয়ানটা চোখ জ্বালা ক'রে যায় আর কি?

—তারপরে?—সুমিত্রা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তর দিতে গিয়ে শঙ্কর থমকে গেল। উত্তেজনার মুহূর্তে সে প্রথমে সুমিত্রাকে খেয়ালই করেনি। এখন সবিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, তোমার বৌদিদি।

বৌদিদি? শঙ্কর তবু যেন বুঝতে পারছিল না।

শ্রীমন্ত লজ্জিতভাবে বললে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিয়ে হ'ল, তোমাদের কাউকে জানাতে পারিনি। মাকে বোলো একদিন ওকে নিয়ে যাবো তোমাদের বাড়ী।

তারপরে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে, ওর নাম শঙ্কর। ওদেরই বাড়ীতে আমি মানুষ হয়েছি। শোভাবাজারের ঘোষদের নাম শোনোনি? তাদেরই বাড়ীর ছেলে।

বিদ্যুৎবেগে অনেক কথা সুমিত্রার মাথার ভিতর দিয়ে ঘুরে গেল। বললে, বুঝেছি, তুমি হৈমন্তীর ভাই?

—ছোটদিকে আপনি চেনেন?

—ঠিক চিনি না, নাম শুনেছি অনেক বার। বোলো, তোমার

জন্যে চা নিয়ে আসি। শেষে তোমার ছোটদির কাছে গিয়ে নিন্দে করবে, ওদের বাড়ী গেলাম, এক পেয়ালা চা-ও খাওয়ালে না।

দ্রুতপদে সুমিত্রা ভিতরে চলে গেল।

শ্রীমন্ত এক দৃষ্টে সুমিত্রার মুখের দিকেই চেয়েছিল। এখন শঙ্করের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তারপরে?

—আরও কিছু চাল চাই যে শ্রীমন্তদা।

—বেশ তো। কালকে দিয়ে আসব। কিছু লজ্জা কোরো না আমাকে।

—না। লজ্জা করব কেন?

ব'লে শঙ্কর বুক-পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বের করলে।

বললে, সেবারের চালের দাম তো ব'লে আসোনি। মা বললেন, পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে যা। বেশী হলে শ্রীমন্তকে বলবি এর পরের দিন যখন আসবে যেন চেয়ে নিয়ে যায়।

দু'মণ চালের দাম তখন ত্রিশ টাকা। কিন্তু বিনা দ্বিধায় শ্রীমন্ত সমস্ত টাকাই পকেটে ফেললে। বললে, না। মাকে বোলো এর চেয়ে বেশি লাগবে না আর বোলো কালকেই হোক, আর পরশুই হোক, আরও এক বস্তা চাল আমি সেদিনকার মতো গিয়ে দিয়ে আসব।

খুশি হয়ে শঙ্কর উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময় সুমিত্রা এক হাতে একটা প্লেটে খাবার, অন্য হাতে চা নিয়ে এসে ওর সামনে রাখলে।

শঙ্কর আবার বসলো।

খেতে-খেতে বললে, আপনারা দুজনে একদিন কিন্তু আমাদের বাড়ী আসবেন বৌদি। নইলে মা খুব দুঃখ করবেন।

—নিশ্চয় যাব। তোমার ছোটদি রয়েছেন তো? তাঁকে বোলো একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসব।

—বেশ।

শঙ্কর চলে যাওয়ার পরে শ্রীমন্ত সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলে, ক'বারই তুমি হৈমন্তীর কথা বললে সুমিত্রা। তুমিও কি তার সম্বন্ধে 'জেলাস' হতে আরম্ভ করলে?

সুমিত্রা ওর ঈজি-চেয়ারের হাতলের উপর বসলো।

বললে, না। কেন বলো তো? হৈমন্তীর সঙ্গে দেখা করব শুনে কি ভয় করছে তোমার?

—ভয় কেন করবে?

—পাছে তার কাছ থেকে বুক-পোড়ানো মন্তরটা শিখে আসি?

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, সে কি সবাই পারে?

কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা ছিল। সেই খোঁচা সুমিত্রার বুকে বিঁধলো। এবং সুমিত্রার মুখে কে যেন মুহূর্তের মধ্যে কালি মাখিয়ে দিলে।

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি নিজের কথা সংশোধন ক'রে বললে, তুমি হ'লে ভরা বর্ষার মেঘ, আর ও হ'ল বজ্র। বজ্রেরই কাজ বুক পোড়ানো,—মেঘের নয়।

সুমিত্রা বুঝলে, এটা সান্ত্বনা। কিন্তু এ নিয়ে কলহ করতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না। বরং প্রকাশ্যে হেসে ব্যাপারটাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেবারই চেষ্টা করলে।

জিজ্ঞাসা করলে, শঙ্কর কি জন্যে এসেছিল?

শ্রীমন্ত হেসে বললে, সে এক কলঙ্কজনক ইতিহাস। চাল পাওয়া যাচ্ছে না জানো তো? চালের অভাবে 'দেবধামে' বহু দাসী চাকর ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু চাল ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে কিনে কোনো রকমে চালাচ্ছেন। কিন্তু সে যা চাল, তা মানুষের খাদ্য নয়। তবু অভাবের তাড়নায় 'দেবধামের' অন্য সবাই তাই কোন রকমে খাচ্ছেন। কিন্তু বড়বাবু পারছেন না।

—এই ব্ল্যাক-মার্কেট কি এমনি করেই চলবে?

—চলবে। কারণ যারা চালের মহাজন, বেশী লাভের লোভে তারা চাল লুকিয়ে ফেলেছে। সেই চাল ব্ল্যাক-মার্কেটে চড়া দামে বিক্রি করছে।

—চাল লুকুচ্ছে কোথায়? হাজার হাজার বস্তা চাল তো সহজ নয়। ধরা পড়ছে না কেন?

—না। ধরা না পড়বার কৌশল জানে তারা। যেখানে ইংরেজের রাজত্ব যাবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। ব্ল্যাক-মার্কেটে ইংরেজের রাজত্ব যাবার আশঙ্কা তো নেই। তাই অবারিত ঘুষের জোরে ব্ল্যাক-মার্কেট প্রকাশ্যেই চলেছে।

—কিন্তু লোকের কত কষ্ট হচ্ছে?

শ্রীমন্ত হো হো করে হেসে উঠলো।

বললে, ভারতবর্ষে লোকের কষ্ট কবে কম সুমিত্রা? বরাবরই তো এরা পঙ্গপালের মতো জন্মায় আর পিঁপড়ের মতো মরে। এ আর একটা নতুন ব্যাপার কি?

ওর কথা শুনে এবং বলবার ভঙ্গি দেখে সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে গেল।

শ্রীমন্ত বলতে লাগলো:

—ব্ল্যাক-মার্কেট কি শুধু বড় মহাজনেই করছে ভেবেছ? খি-

চাকরগুলো পর্যন্ত এই নেশায় মেতেছে। তারা সদলবলে এসে কণ্ট্রোলের দোকান থেকে কণ্ট্রোলের দরে চাল, চিনি, কেরোসিন নিচ্ছে, আর অসহায় ভদ্রলোকদের কাছে চারগুণ দামে তাই বিক্রি করছে।

—বলো কি, তারাও?

শ্রীমন্ত বললে, এদিকে ঝি-চাকর খোঁজো, পাবে না। বোমার ভয়ে যারা পালিয়েছিল সব ফিরে এসেছে। কিন্তু তারা এখন আর লোকের বাড়ী চাকুরী করতে চাচ্ছে না। সেদিন সোমেশ কি বললে জানো?

কি বললে?

—ওদের বাড়ীর ঝিটা ছেলের অসুখে দেশে যাবার নাম ক'রে সরে পড়েছে। সোমেশের স্ত্রী পাশের বস্তীর একটি স্ত্রীলোককে ডেকে বললেন, একটা ঝি দেখে দিতে পারো দিদি? একগাল হেসে স্ত্রীলোকটি বললে, দিন কতক এখন নিজেই বাসন ক'খানা মেজে নাও দিদি; ঝি আর পাওয়া যাবে না। কণ্ট্রোলে দাঁড়িয়ে তারা দিন দুটো ক'রে টাকা রোজগার করছে। শুনলে কথা?

সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে শুনলে।

জিজ্ঞাসা করলে, লাভের নেশায় এই যে সব মানুষ উন্মাদ হয়ে ছুটে চলেছে, এর পরিণাম কি বলতে পারো?

—মৃত্যু। লাভের নেশায় যারা ট্যাঙ্ক নিয়ে যুদ্ধে চলেছে, তাদেরও যে পরিণতি, এদেরও তাই।

তবে যাচ্ছে কেন?

শ্রীমন্ত হাসলে। বললে, আলোর দিকে পতঙ্গ কেন ছোটে?

সুমিত্রা নিঃশব্দে ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলে, শঙ্করদের যে মিহি চাল দেবে, সে চালের তোমার যোগাড় আছে ?

—আছে।

—কি ক'রে যোগাড় করলে গো ? এক বস্তা চাল তো আজকের দিনে সামান্য ব্যাপার নয়।

শ্রীমন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে বললে, তোমাকে জানাতে সঙ্কোচ নেই, বেনামীতে তিনখানা কণ্ট্রোলের দোকান আমি চালাচ্ছি। ব্যাঙ্কে যে টাকা আমার জমেছে, তার অধিকাংশই এই থেকে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি লজ্জা পাচ্ছ। কিন্তু যুদ্ধের পরে হীরে মুক্তো সোনায় তোমার সমস্ত লজ্জা ঢেকে দোব, এই প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তৃপ্তির আনন্দে শ্রীমন্ত হা হা করে হাসতে লাগলো।

ট্যাক্সির পিছনে এক বস্তা চাল লুকিয়ে নিয়ে সুমিত্রা ও শ্রীমন্ত 'দেবধাম' রওনা হ'ল।

সন্ধ্যার মুখে। সূর্যের আলো তখন নেই, কিন্তু আলোর আভা একেবারে মিলিয়ে যায়নি। তারই একটুখানি সুমিত্রার প্রসাধনসুন্দর মুখে এসে পড়েছে।

শ্রীমন্ত আড়চোখে চেয়ে দেখলে, সুমিত্রা আজ যেন বিশেষ ক'রে সেজেছে। ওই জমকালো শাড়ীখানা সেদিন শ্রীমন্ত সাধ্যসাধনা ক'রেও সুমিত্রাকে পরাতে পারেনি। এত গহনাও সুমিত্রাকে সে এর আগে কখনও পরতে দেখেনি।

এ কি তার যোদ্ধবেশ ?

হৈমন্তীর সামনে সে কি তার ঐশ্বর্যের বর্মচর্ম পরিধান করে দাঁড়াতে চায়?

শ্রীমন্ত মনে মনে হাসলে। মুখে কিছু বলতে সাহস করলে না। সুমিত্রার কাছে হৈমন্তীর প্রসঙ্গে হৈমন্তীর পক্ষ টেনে কিছু বলতে এখন সে ভয় পায়।

সেদিনকার মতো আজও ওদের ট্যাক্সি একেবারে 'দেবধামের' ভিতরে গাড়ী-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আজ আর শঙ্কর এলো না ওদের সম্বর্ধনা করতে।

রঘুয়া বললে, উপরে যান বাবু। মা ডাকছেন।

শ্রীমন্ত ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রঘুয়াকে বললে, পিছনের ক্যারিয়ারে এক বস্তা চাল আছে। সেটা নামিয়ে নাও। খবর সব ভালো তো রঘু?

চালটা নামাতে-নামাতে রঘুয়া বললে, ভালো কিছু নয় বাবু। উপরে গেলেই শুনতে পাবেন।

শ্রীমন্তর বুক ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো: কি এমন খারাপ খবর! কে জানে কার আবার কি হ'ল।

ওরা দু'জনে দ্রুতপদে দোতলায় গেল। হিমাংশুবাবুর দরজা বন্ধ। ওদিকের বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে শোকের প্রতিমূর্তির মতো নয়নতারা স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে।

ওরা তাঁকে প্রণাম করতেই দু'জনের মাথায় হাত রেখে তিনি আশীর্বাদ করলেন।

—এসো মা, ভিতরে এসো। অ কদম, এ ঘরে দু'টো আসন দিয়ে যা তো।

—কিছু দরকার নেই মা। এই তো চমৎকার বসলাম। ওরা

মেঝেতেই ব'সে পড়লো এবং উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে গৃহিণীর দিকে চেয়ে রইলো।

মিনিট খানেক নিঃশব্দে থেকে নয়নতারা বললেন, শঙ্করকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে।

—শঙ্করকে !—ওরা দুজনে চমকে উঠলো। কেন ?

—আমাদের দেউড়ির পাশে যে চিঠির বাক্স আছে, সেইটেতে কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে ও আগুন দিচ্ছিল।

—তারপরে ?

—পিছন থেকে মোটরে ক'রে পুলিশ আসছিল, ওরা টের পায়নি। এসেই ওদের ধ'রে ফেলে।

শ্রীমন্ত ও সুমিত্রা স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো।

নয়নতারা বললেন, ছাড়াবার জন্যে বহু চেষ্টা হচ্ছে, হয়তো ছাড়া পয়ে যেত। কিন্তু শঙ্কর জেলে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর। সে যেন ছাড়া পেতেই চায় না।

নয়নতারা আবার বললেন, এ বাড়ীর ছেলে জেলে গেল এই প্রথম। তা যাক্। কিন্তু যাদের সঙ্গে মিশে জেলে গেল সেইটেই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা কারা জান, এ পাড়ার যত ভবঘুরে ছেলে। তাদের না আছে চাল, না আছে চুলো। জীবনে কখনও ও তাদের সঙ্গে মেশেনি। তাদের চেনে কি না সন্দেহ। কেন যে এমন মতিগতি হ'ল!

নয়নতারা শঙ্করের জেলে যাওয়া মার্জনা করতে প্রস্তুত। কিন্তু যার-তার সঙ্গে মিশে যে জেলে গেল, এইটে কিছুতে মার্জনা করতে পারছেন না। এ-বংশের ধারা যেন ও বদলে দিতে যাচ্ছে। সেইটেই পরিপাক করা ওঁদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে।

সেই ভারী নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেকক্ষণ ব'সে থেকে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, হৈমন্তীদি কোথায় মা ?

নয়নতারা ব্যস্তভাবে বললেন, ওমা তাই তো ! সে বোধ হয় তোমাদের আসা টেরই পায়নি। অ কদম, বৌমাকে ছোট দিদিমণির ঘরে নিয়ে যা তো। বড্ড আঘাত পেয়েছে মা সে। আজ সকালে শঙ্কর ধরা পড়লো, তার পর থেকে আর ওঠেনি। সে যে কি ক'রে ভালোয়-ভালোয় নেয়েধুয়ে উঠবে মা, সেই আর এক চিন্তা।

নয়নতারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

কদম এসে সুমিত্রাকে তেতলায় হৈমন্তীর ঘরে নিয়ে গেল।

হৈমন্তী দরজার দিকে পিছন ক'রে খাটে শুয়েছিল। ওদের পায়ের শব্দে পাশ ফিরেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। সুমিত্রার দিকে এক-মুহূর্ত অবাক হয়ে সে চেয়ে রইলো। ধীরে ধীরে ওর মুখ অনাবিল হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

আস্তে আস্তে বললে, আপনি বৌদি, না শঙ্করের মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

হৈমন্তী ওকে জড়িয়ে ধ'রে খাটে নিয়ে এসে বসালে।

বললে, আপনার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করবার ছিল। কিন্তু এমন একটা নিরানন্দ দিনে এলেন যে, ঝগড়া করারও মন নেই।

সুমিত্রা বললে, শঙ্কর-ঠাকুরপোর কথা শুনলাম। কিন্তু দুঃখ ক'রে লাভ নেই ছোটদি। যুগের হাওয়া কেউ রোধ করতে পারে না। নইলে রায়বাহাদুরের বংশধর সাধারণের ছেলেদের সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা পড়ে ?

—কেন এমন হচ্ছে বৌদি?

—কি জানি ভাই। কিন্তু হচ্ছে,—শুধু এখানেই নয়, পৃথিবী জুড়ে সর্বত্রই এই হচ্ছে। নীল রক্তের আভিজাত্য আর বুঝি থাকে না।

—আমাদের অপরাধ কি?

—মানুষকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা মস্ত বড় অপরাধ দিদি। দীর্ঘকালের সঞ্চয়ে সেই অপরাধ পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর ভারকেন্দ্র আজ টলেছে। তাইতেই বুঝি এই বিপর্যয়।

একটুক্ষণ চিন্তা ক'রে হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করলে, শঙ্করকে কি ছাড়ানো যাবে না?

—জেলের থেকে? কেন যাবে না? এই শহরে আপনাদের কত বড় বড় আত্মীয়-স্বজন। তাকে ছাড়িয়ে আনা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? তার মধ্যে নীল রক্তের ধারা বোধ করি স্তিমিত হয়ে এসেছে। আমার সন্দেহ হয়, 'দেবধামে'র উত্তরাধিকারীকে আপনারা আর কোনো দিন ফিরে পাবেন না।

—ওসব কথা বলবেন না বৌদি। আমার বড় ভয় করে।

—ভয়েরই তো কথা ছোটদি। সেইজন্যেই মায়ের কাছে আমি চুপ করে ছিলাম। আপনাকে বলছি এই জন্যে যে, আপনি হয়তো প্রকৃত অবস্থা বুঝবেন।

হৈমন্তী উষ্মার সঙ্গে বললে, 'দেবধামে' নীল রক্ত শেষ হয়ে আসছে, একথা বুঝতে আমার ভালো লাগবে, এ আপনি কেমন ক'রে প্রত্যাশা করেন?

সুমিত্রা হাসলে। বললে, ভালো লাগার কথা নয় ছোটদি। ভালো লাগবে না তাও জানি। তবু তৈরি থাকা ভালো। তাতে আঘাত কম লাগে।

হৈমন্তী হঠাৎ চটে গেল। তার চোখ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। বললে, এসে পর্যন্ত তুমি শক্ত-শক্ত কথা শোনাচ্ছ কেন জানিনে বৌদি। ওসব আমার ভালো লাগে না।

গ্রীবা বেঁকিয়ে হৈমন্তী গুম হয়ে বসে রইলো।

সুমিত্রা এবার জোরে জোরে হেসে উঠলো। বললে, কী সুন্দর! তোমার এই রূপ দেখবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম ছোটদি। এতক্ষণে দেখতে পেলাম!

হৈমন্তী অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলো।

সুমিত্রা ওকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বলতে লাগলো: যেদিন থেকে তোমার কথা শুনেছি, তোমাকে কল্পনা করেছি হোমাগ্নি শিখার মত। এসে দেখি, সেই শিখা জ্যোতিঃহীন, ধোঁয়ায় মলিন। দুঃখ হ'ল। ভাবলাম, প্রথম দিনে তোমার এই মলিন রূপ দেখেই কি ফিরে যেতে হবে? ভাগ্য ভালো, তুমি প্রসন্ন হ'লে। তোমার চোখে আগুন দেখতে পেলাম।

হৈমন্তী বললে, কী পাগলের মতো এলোমেলো বকছ বৌদি?

সুমিত্রা প্রাণপণবলে ওকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, এলোমেলোই বটে। এ তুমি বুঝবে না, বোঝবার চেষ্টাও কোরো না। তোমাকে আমি কত রাত্রি স্বপ্ন দেখেছি, জানো?

—স্বপ্ন দেখেছ? আমাকে?—হৈমন্তীর বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

—হ্যাঁ, তোমাকে। সংসারে একটিমাত্র মেয়ে, যাকে আমি—সুমিত্রা—স্বপ্ন দেখি।

—কেন বলো তো?

—তোমার শক্তি আমাকে অভিভূত করেছে।

—আমার শক্তি? আমাকে তো তুমি চিনতেই না বৌদি! আমার শক্তির তুমি কী জানো?

সুমিত্রা হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলে। হেসে বললে, বিশেষ কিছুই জানিনে ছোটদি, তবু তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বকে-বকে গলা যে শুকিয়ে গেল। একটু চা-ও কি খাওয়াবে না?

হৈমন্তী হেসে বললে, আমার অন্নপূর্ণা মায়ের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, তখন ভয় কিছুই নেই। ওই দেখ, কদম চা এনেছে দু'জনেরই। রাত্রে নিশ্চয় খেয়েও যেতে হবে। শ্রীমন্তদা কোথায় কদম?

—বাবুর ঘরে।

কদম টিপয়ের উপর দুজনের চা-খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল।

শ্রীমন্ত আবার বাবুর ঘরে! হৈমন্তী ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু কিছু বললে না।

ট্যাক্সিতে ব'সে শ্রীমন্ত প্রথম কথা কইলো: বড়বাবু একেবারে মুষড়ে গেছেন। মুহুর্মুহুঃ শুধু মদ খাচ্ছেন আর কাঁদছেন।

সুমিত্রা বোধ করি অন্যমনস্ক ছিল। বললে হুঁ।

শ্রীমন্ত বলতে লাগলো, শুধু ছেলের জেলই নয়। সংসারের অবস্থাও ভালো নয়। দু' লক্ষ টাকার দু'টো ডিক্রি ঝুলছে। এটর্নী জানা লোক। তাঁকে ব'লে-ক'য়ে কোনো রকমে থামিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আর বোধ হয় থামানো যায় না। জমিদারীর কিছু কিছু বিক্রি হয়ে গেছে। বাকিও বুঝি যায়। বড়বাবুর ধারণা, এই দুঃখেই শঙ্কর জেলে গেছে। বোধ হয় ভেবেছে, নিজের চোখে সেই সর্বনাশ দেখার চেয়ে জেলে ব'সে থাকা ভালো।

অন্যমনস্কভাবেই সুমিত্রা আবার বললে, হুঁ।

—আমি ব'লে এলাম, জমিদারী আপনার একটা আয়। এটা

রাখতেই হবে। বাড়ীখানা বিক্রি ক'রে দিন। এ বাজারে ওর দাম তিন লক্ষ টাকার কাছাকাছি হবে। এত বড় বাড়ীর কোনো দরকার নেই। দেনা শোধ ক'রে বাকি টাকা দিয়ে একটা ছোট বাড়ী কিনুন। তাতে খরচও অনেক বাঁচবে। ভদ্রলোক হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন।

কান্নার কথায় সুমিত্রা চমকে উঠলো। বললে, কে কাঁদলে?

—বড়বাবু।

—কেন?

কি বলো? কত পুরুষের 'দেবধাম'! ওদের সমস্ত মর্যাদা, সমস্ত আভিজাত্য ওই বাড়ীর ইটের সঙ্গে গাঁথা। সেই বাড়ী বিক্রি করার কথায় কে না কেঁদে পারে?

সুমিত্রা নিঃশব্দে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।

শ্রীমন্ত নড়ে-চড়ে বেশ শক্ত হয়ে ব'সে বললে, কিন্তু বাড়ী ওঁকে বিক্রি করতেই হবে। না করলে ওঁকে জমিদারীও বিক্রি করতে হবে, বাড়ীও।

সুমিত্রা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, দেনা কি খুব বেশী হয়েছে?

—বেশী হয়নি? দু'লক্ষ টাকার তো ডিক্রিই ঝুলছে। আরও কত আছে কে জানে? আমার বিশ্বাস, আরও অন্ততঃ লাখখানেক টাকার আছেই।

সুমিত্রা সাড়া দিলে না। বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

একটু পরে শ্রীমন্ত হঠাৎ জোরের সঙ্গে বললে, বাড়ীটা ওঁকে বিক্রি করাতেই হবে। ওটা আমার চাই।

সুমিত্রা অবাক হয়ে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইলে। বললে, ওর তো অনেক টাকা দাম!

—তার জন্যে চিন্তা করি না। সে জোগাড় হয়ে যাবে।—শ্রীমন্ত অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলে।

বললে, আজ বলামাত্র কেঁদে ফেললেন। আর একদিন এসে ভালো ক'রে বোঝাতে হবে। মারোয়াড়ীর হাতে যাওয়ার আগে আমার হাতে আনতে হবে।

—ওই পুরোনো বাড়ীর উপর তোমার এত লোভ কেন? তুমিও কি আর একটা অভিজাত-বংশের পত্তন করতে চাও?

—না। আভিজাত্যের পরিণতি আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু যখন ভাবি, ওই বাড়ীতে অনুগৃহীত অনাথ বালকের মতো আমি মানুষ হয়েছি, তখন ওর মালিক হবার জন্যে আমার লোভ দুর্জয় হয়ে ওঠে।

বাকি পথটুকু ওরা দুজনে নিঃশব্দে চললো। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই শ্রীমন্ত সচেতন হয়ে উঠলো। ড্রাইভারকে বললে, রোকো, ওই সামনের বারান্দাওয়ালা বাড়ী।

গাড়ী থামলো। কিন্তু সুমিত্রার তখনও ধ্যান ভাঙেনি। তাকে একটা ঠেলা দিয়ে শ্রীমন্ত বললে, ওঠো। এসে গেছি।

—এর মধ্যে এসে গেছি?

মন্ত্রাভিভূতের মতো সুমিত্রা উঠলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার চেয়ে শ্রীমন্ত ট্যাক্সি-ভাড়াটা মিটিয়ে দিলে।

সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে বললে, তুমি কী ভাবছ বলো তো?

—কী হবে শুনে?—সুমিত্রা হেসে উত্তর দিলে।

—শুনি না?

—তোমার হৈমন্তীর কথা।

—আমার হৈমন্তী?—শ্রীমন্তর কণ্ঠস্বরে অপরিসীম বিস্ময়।

পাখাটা খুলে দিয়ে শ্রীমন্তর চেয়ারটা ঘুরে ওদিকের চেয়ারে গিয়ে সুমিত্রা বসলো।

বললে, হ্যাঁ গো, তোমারই হৈমন্তী। ওই তো 'দেবধামের' আত্মা।

তাই তো 'দেবধামের' উপর তোমার লোভ এত দুর্জয়! দাঁড়াও একটু কফির ব্যবস্থা ক'রে আসি।

হাওয়ায় শাড়ীর তরঙ্গ তুলে সুমিত্রা ভিতরে গেল।

ফিরে এসে সুমিত্রা নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রে নিঃশব্দে দুষ্টুমিভরা হাসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, হাসো কেন?

সুমিত্রা জবাব দিলে না। আরাম কেদারায় একটা লোভনীয় এলায়িত ভঙ্গিতে ব'সে শুধু তেমনি ক'রে হাসতে লাগলো।

—বলো না কেন হাসছ?

—শুনবে? হৈমন্তীর চোখে আমিও আগুন দেখে এলাম।

—আগুন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগুন। যে-আগুনে তুমি পুড়েছ, বোধ করি 'দেবধাম'ও পুড়বে। সে কী সুন্দর!

চায়ের পেয়ালা শ্রীমন্ত মুখে তুলছিলো, আবার নামালে। বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, মাঝে মাঝে তুমি কী যে হেঁয়ালি বলো সুমিত্রা, আমি থেই পাইনে। আগুন তুমি কাকে বলছ?

—সে তুমি বুঝবে না। হৈমন্তীও বুঝতে পারেনি। হৈমন্তী জানে, তোমার কাছে সে হেরেছে। তুমি পাথরের। তুমি হৃদয়হীন, তুমি সাপের চেয়েও ক্রূর। কিন্তু আমি জানি, সে হারেনি, জিতেছে। তুমি যে পাথরের সে আমিও জানি। কিন্তু আমি আরও জানি যে, এই পাথরও সে টলিয়েছে। তার চোখের আগুনের দিকে চেয়ে সাপও মুহূর্তকালের জন্যে মুগ্ধ হয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে।

—এসব কী কথা বলছ তুমি?—শ্রীমন্ত চীৎকার ক'রে উঠলো।

একটা হাত তুলে সুমিত্রা তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলে।

বললে, থামো। তোমার সব কথা আমি জানি। নেশার ঘোরে তোমার সমস্ত বেদনার কথাই আমাকে শুনিয়েছ। লজ্জা পাচ্ছ? তোমারও লজ্জা আছে?

সুমিত্রা জোরে জোরে হেসে উঠলো।

বললে, হৈমন্তীকে দেখলাম। নিজেকেও চিনি। যখন ভাবি, আমাদের মতো মেয়ে কি ক'রে তোমার মতো হৃদয়হীন পাষণ্ডের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়লাম, তখন আর কিনারা পাইনে। তুমি কি রাগ করছ?

—না। অতি-প্রশংসায় ভিতরে-ভিতরে বিগলিত হচ্ছি। কিন্তু তুমি একথা বলছ সুমিত্রা?

—অর্থাৎ মন্দকে মন্দ বলবার অধিকার শুধু তাদেরই আছে যারা নিষ্কলঙ্ক। এই কথা বলতে চাও তো? তাহ'লে শোনো, ভালো আমিও নই। আমাদের বর্তমান সমাজের ভালো-মন্দের বিচারে আমার স্থান যে অনেক নিচে সে আমি জানি। তবু বলি, আমি তোমার মতো পাষণ্ড নই। আমার হৃদয় আছে।

কঠিন কণ্ঠে শ্রীমন্ত বললে, এই নতুন সংবাদের জন্যে ধন্যবাদ সুমিত্রা। তোমার হৃদয়ের কথাটা জানা রইলো, ভালোই হ'ল।

সুমিত্রার সমস্ত মন আজ যেন একটা প্রচণ্ড শক্তিতে কাজ করছে। শ্রীমন্তের বিদ্রূপ শেষ হবার আগেই তার মন হৈমন্তী-সুমিত্রার দিক থেকে তেমনি প্রচণ্ড বেগে শঙ্করের দিকে ধাবিত হ'ল। শ্রীমন্তর কথা বোধ করি তার কানেই গেল না।

বললে, হ্যাঁগা, শঙ্করকে ছাড়াবার কি করছ?

বিস্ময়ে শ্রীমন্তর চোখ কপালে উঠলো :

—তুমি কী পাগলের মতো বকতে আরম্ভ করলে আজ! স্নেহাংশু ঘোষের নাতি, হিমাংশু ঘোষের ছেলেকে ছাড়িয়ে আনব আমি ?

—হ্যাঁ তুমি। এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে যোগ্য লোক আর কেউ নেই। মানুষের পায়ে হাত দিতেও তোমার যতক্ষণ, ঘাড়ে হাত দিতেও ততক্ষণ। বিশেষ তিনখানা কণ্ট্রোলের দোকান তুমি চালাচ্ছ। বহু লোকের সঙ্গে তোমার ডান-হাত বাঁ-হাতের সম্পর্ক। এ কাজ তোমার মতো সহজে আর কেউ পারবে না। কালকেই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। করবে কি না বলো ?

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে শ্রীমন্ত বললে, করবো চেষ্টা। কিন্তু সে কেন জেলে গেছে জানো ?

—শুনেছি।

—যদি সে ছাড়া পেতে না চায় ?

—তবু তাকে ছাড়িয়ে আনতেই হবে, বুঝিয়ে-শুঝিয়ে যেমন ক'রে হোক। বুঝলে ?

—বুঝলাম।

[ ১৮ ]

লালবাজারের লক্-আপে শঙ্করের কাটলো তিন দিন।

সোমবারে সে ধরা পড়ে। মঙ্গলবারে তাকে কোর্টে হাজির করে। কোর্ট আবার তাকে পুলিশের জিম্মাতেই সমর্পণ করে। সেই থেকে সে সেখানেই।

অন্ধকার একখানা ঘর। তাতেই ঠাসাঠাসি ক'রে তারা পঁচিশ-ত্রিশ

জন। অন্ধকারে প্রথমে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। এখন সয়ে গেছে। চোখ অন্ধকারে কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এই ঘর থেকে দিনরাত্রি সর্বক্ষণ যে চীৎকার উঠছে, শঙ্করের পক্ষে সেইটেই সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

এতদিন মস্ত বড় বাড়ীতে তার দিন কেটেছে। সে বাড়ীতে চীৎকার করলেও বোধ করি বিশেষ এসে-যায় না। কিন্তু অভিজাত বাড়ীর চাল-চলনই স্বতন্ত্র। সেখানে কেউ জোরে কথা বলে না। চাকর-বাকর নিঃশব্দে কলের মতো কাজ ক'রে যায়। তারা নিজেরাও আস্তে কথা বলে। এই রেওয়াজ।

গারদখানার অবিশ্রান্ত হাসি-গান-হুল্লোড়ে সে যে অস্থির হয়ে উঠবে, সে আর বিচিত্র কি!

সোমবারে যখন সে লক্-আপে এলো, তখনও তার খাওয়া হয় নি। সমস্ত দিন একপ্রকার অনাহারেই কেটেছে। বিকেলে একজন লোক তাদের আঁচলে-আঁচলে একমুঠো ক'রে মুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। সেই মুড়ি দাঁতে কাটবার কথা মনে হতেই তার গা'টা পাক দিয়ে উঠলো।

সে শুধু একগ্লাস জল চাইলে।

—এক গ্লাস!—লোকটা গভীর অবজ্ঞায় অট্টহাস্য ক'রে উঠলো, —গ্লাস কোথায় পাব চাঁদ! এ কি শ্বশুরবাড়ী পেয়েছ! একটু কষ্ট ক'রে এই দিকে একটু এগিয়ে এসে হাত পাত, জল ঢেলে দিই, আশ মিটিয়ে খাও। কি বল?

শঙ্কর কিছুই বললে না। তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। আঁজলা ক'রে জল সে কখনও খায়নি। একটুখানি তৃষ্ণার জল দিতে কেউ যে কারও সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করতে পারে সে ধারণাও ছিল না। আঁচলের মুড়ি সে পাশের ছেলেটির আঁচলে ঢেলে দিলে।

সেটি তাদেরই পাড়ার বস্তির একটা ছেলে। তারই বয়সী হবে। সমস্ত দিনের পর ছেলেটি ক্ষুধার জ্বালায় সেই শুকনো মুড়িই গোগ্রাসে মশ মশ করে চিবুচ্ছিল।

শঙ্কর যখন তার আঁচলে মুড়িগুলো ঢেলে দিচ্ছিল, সে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুখ তখন তার মুড়িতে ভর্তি। তার মাথা নাড়া শঙ্কর দেখতে পায়নি।

সে নিঃশব্দে মুড়ি ঢেলে দিয়ে নর্দমার কাছে স'রে এসে বদ্ধাঞ্জলি পাতলো।

সমস্ত দিন হাত-মুখ ধোয়া হয়নি। হাতে কত ময়লা যে লেগে আছে তার ঠিক নেই। মুখ-চোখ-কান এবং ঘাড়ের পাশটা ধোয়া দরকার।

আ! কী ঠাণ্ডা জল! শরীর যেন জুড়িয়ে যায়!

আবার লোকটি তেমনি কর্কশকণ্ঠে হেসে উঠলো :

—বাবুসাহেবকে একখানা সাবান এনে দোব কি?

না। এরা সমস্ত দিনের পর কয়েদীকে মুখ-হাতটা ধুতে দিতেও চায় না। হাত ভালো ক'রে ধোয়াও হোল না। তৃষ্ণায় শঙ্করের ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো। কী জল, জলে ময়লা আছে কি না, তাও দেখার সুযোগ নেই। শঙ্কর সেই মলিন হাতেই অঞ্জলি পেতে ঢক ঢক ক'রে আকণ্ঠ জল পান করলো।

তার পর নিজের কম্বলে এসে নিঃশব্দে, চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লো।

এখন ক'টা কে জানে। বিকেল না সন্ধ্যা ঘরের ভিতর থেকে তাও বোঝবার উপায় নেই।

বস্তির সেই ছেলেটির নাম কাশীনাথ।

কাশীনাথের মায়ের বাড়ী আগ্রার কাছে। বাপ বাঙ্গালী। মায়ের আলুর দোকান আছে হাতিবাগানের বাজারে। বাপ করে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রির কাজ। কি ক'রে ওদের তুজনের পরিচয় হয়েছিল সে ইতিহাস এখানে অনাবশ্যক। বস্তি-জীবনে এমন হামেশাই হয়ে থাকে।

'দেবধামের' তিনখানা বাড়ীর পরে যে খোলার বস্তি, সেইখানে ওরা স্বামী-স্ত্রীভাবে বাস করে। সেইখানেই কাশীনাথের জন্ম। সেইখানেই কাশীনাথের বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে।

কাশীনাথের যখন জন্ম হোল, তার নামকরণ নিয়ে বাপমায়ের মধ্যে একটা মতভেদ দেখা দেয়। বাপ বাঙ্গালী, সে চায় একটা হাল-ফ্যাশানের বাঙ্গালী নাম রাখতে। মা আগ্রাবাসিনী, সে চায় সেইদেশীয় তার মনের মতো একটা নাম রাখতে।

বস্তিতে ছিল এক দরিদ্র উড়িয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কলেজ স্কোয়ারের সামনের ফুটপাথে ছক পেতে সে পথিকের করকোষ্ঠি বিচার করতো। সে ওদের মীমাংসা ক'রে দিলে।

বললে, নাম রাখো কাশীনাথ। কাশী হচ্ছে ক'লকাতা আর আগ্রার মাঝামাঝি।

এই মধ্যস্থতা ওদের তুজনেরই খুব পছন্দ হোল: ক'লকাতাও নয়, আগ্রাও নয়,—কাশী। যেখানে অন্ন-বস্ত্রের জন্যে স্বামী এবং স্ত্রী কেউ কারও মুখাপেক্ষী নয়, সেখানে এর চেয়ে সমীচীন আপোষ আর কী হতে পারে?

ক'লকাতা আর কাশীর মধ্যবর্তী পান্থনিবাসের মতো কাশীনাথ বাড়তে লাগলো। লেখাপড়া শেখবার বয়স হ'লে বস্তির আরও পাঁচটি ছেলের সঙ্গে সে কর্পোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'ল। একটু ইংরাজি,

খানিকটা বাংলা এবং অঙ্ক শিখলে। বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হ'লে সেও বাপের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকের কাজ শিখতে লাগলো।

মায়ের ইচ্ছা ছিল, কাশীনাথ তার আলুর দোকান দেখে। কিন্তু ছেলেকে কুড়ের ব্যবসায় দিতে বাপের মন সরলো না। সে নিজের ব্যবসাতেই ছেলেকে টানলে। মা বাধা দিলে না।

সেই থেকে সে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি।

হাতে পয়সা পড়তেই তার চেহারার পরিবর্তন হতে লাগলো। মায়ের দৌলতে রংটা বরাবরই ফর্সা। এখন তাতে সাবান-স্নো পড়লো। মাথার চুলে পড়লো টেরি। গায়ে দামী ছিটের সার্ট। পায়ে নিউ-কার্ট।

সে যে বস্তিতে থাকে, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি, তা আর বোঝবার উপায়ই রইলো না।

এই অবস্থায় এই ইলেকট্রিক মিস্ত্রি একদিন 'দেবধামের' উত্তরাধিকারীর সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা পড়ে চলে এলো লালবাজারের লক্‌-আপে।

পুলিশের লোকটা চলে গেলে কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কিছুই তো খেলেন না বাবু, রাত কাটবে কি ক'রে?

শঙ্কর সে দুশ্চিন্তা করছিল না। অন্যমনস্কভাবে বললে, কে জানে কি ক'রে কাটবে?

—সকালেও কিছু খেয়ে বেরুননি বোধ হয়?

—সামান্য কিছু খেয়েছিলাম।

কাশীনাথ যেন খুব দুঃখ পেলে ব'লে বোধ হ'ল।

একটু পরে ধীরে ধীরে বললে, আপনি যে কোন বংশের ছেলে সে আমি তো জানি। সেই বাড়ীর দুলাল সমস্ত দিন খায়নি, সারারাত্রি এই কয়েদঘরে একখানা কম্বলের উপর রাত কাটাবে!

সারাদিনের পর এই নিষ্ঠুর লক্-আপের ভিতর এইটুকু আন্তরিক সহানুভূতিতে শঙ্করের চোখ ছাপিয়ে অশ্রু নামলো। কিন্তু সে দাঁতে ঠোঁট চেপে নিঃশব্দে শক্ত হয়ে পড়ে রইলো।

কাশীনাথ বলতে লাগলো, কতদিন যে এখানে থাকতে হবে কে জানে? আপনি চলে যান বাবু।

—কোথায়?

—ঘরে।

এবার শঙ্কর হেসে ফেললে। বললে, আমি চ'লে যেতে চাইলেই কি এরা ছেড়ে দেবে কাশীনাথ? লেটার-বক্সে আগুন লাগাবার সময় ধরেছে। এত সহজে কি ছাড়বে ভেবেছ?

—ঠিক ছাড়বে বাবু। আপনি আপনার বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দিন। বলবেন, যা হবার হয়ে গেছে মশাই, আমাকে ছেড়ে দিন। দেখবেন, তখনই ছেড়ে দেবে। এমন কত বড়লোকের ছেলে ছাড়া পেয়েছে আমি জানি।

শঙ্কর চুপ ক'রে রইলো।

কাশীনাথ বললে, তাই করুন, বুঝলেন?

—না।

শঙ্করের কণ্ঠ থেকে এমন দৃঢ়তা কাশীনাথ প্রত্যাশা করেনি। সে চমকে উঠলো।

বললে, না কেন? এ কষ্ট কি আপনি সইতে পারবেন?

—দু'দিনে সয়ে যাবে। তোমরা সইছ কি ক'রে?

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় ক'রে কাশীনাথ বললে, কী যে বলেন বাবু! আপনার সঙ্গে আমাদের তুলনা! আমাদের হোল খেটে খাওয়া শরীর।

উত্তেজনায় কাশীনাথ একটা বিড়ি ধরালে।

জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বিড়ি খান না কি বাবু?

—না।

জ্বলন্ত দেশলাইটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে কাশীনাথ সেটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আমি ভালো পরামর্শই দিচ্ছি। শুনুন বাবু। কাল সকালেই আপনি মাফ চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শঙ্কর বললে, ঘরে আর আমি ফিরবো না কাশীনাথ। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালোই হ'ল। জেল থেকে বেরিয়ে আমি তোমারই সঙ্গে তোমারই মতো খেটে খেতে চাই।

—ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি হবেন আমার মতো?

—ক্ষতি কি? তোমার কাজ আমাকে শিখিয়ে দিও।

—দেখি আপনার হাতখানা।

শঙ্কর একখানা হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিলে। সেই হাতের তালুটা টিপে কাশীনাথ হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

বললে, এই তুলোর মতো নরম হাতে যন্ত্র ধরা যায় না বাবু।

তারপর বললে, বাপ-মার সঙ্গে রাগারাগি ক'রে এসেছেন বুঝি?

—না।

—তবে আর কেন? তাঁরা কত ভাবছেন দেখুন তো।

শঙ্কর আর কোন কথা বললে না। বোধ করি বাপ-মায়ের ব্যথিত

উদ্বিগ্ন মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এবং কল্পনার স্রোতে তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

শঙ্করের মাথায় যেন সর্ব্বক্ষণ আগুন জ্বলছে। কিছুতে যেন সে স্বস্তি পাচ্ছে না। পুলিশ লক-আপ থেকে তাদের সবাইকে জেল-হাজতে নিয়ে এসেছে। ঘর এখানে অন্ধকার নয়। স্নানাহারের অব্যবস্থাও পুলিশ-লক-আপের মতো অতখানি নয়। একটুখানি খোলা, একটু খানি হাওয়াও আছে। তবু সমস্তক্ষণ ওর মাথায় যেন আগুন জ্বলছে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। বেড়াতে, গল্প করতে ভালো লাগে না। শুধু ভাবে। কিন্তু কি যে ভাবে, তা সে নিজেও জানে না। কোন একটা জিনিষই বেশিক্ষণ ধ'রে স্থির ভাবে ভাববার শক্তি তার নেই! শরতের মেঘের মতো হালকা ভাবনা এলোমেলো ভেসে চলেছে,—একটার পর একটা,—তার যেন আর শেষ নেই।

শেষ পর্যন্ত কি সে পাগল হয়ে যাবে?

দেবধাম।

সবাই বলছে দেবধামে ফিরে যেতে। ধনীর দুলাল সে, জেলের এই অপরিসীম কষ্ট, এ কি সে সহ্য করতে পারে?

কিন্তু কোথায় দেবধাম?

অস্ত-গগনের বর্ণচ্ছটা মহাকালের হাতের ছোঁয়ায় যেমন অতি দ্রুত মুছে যেতে থাকে, দেবধামের ঐশ্বর্যও তেমনি দ্রুত মুছে আসছে। বাইরে থেকে ওরা তার কী জানে?

ওরা দেখছে, মস্ত বড় বড় থাম-ওলা বাড়ী, গেটে তকমাপরা দারোয়ান,

বড় প্রশস্ত মোটর গাড়ী। ওরা কি ক'রে জানবে, বাইরে থেকে যে বিরাট বনস্পতি দেখা যাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে পোকায় তা জীর্ণ ক'রে ফেলেছে। শিকড় গেছে ক্ষয়ে, মাটির বাঁধন গেছে আলগা হয়ে। মাটির থেকে ও আর নতুন ক'রে রস টানতে পারে না।

এর মধ্যে অন্ধকার রাত্রে কখন উঠবে ঝড়। ছন্নছাড়া প্রভাতে উঠে প্রতিবেশীরা সবিস্ময়ে দেখবে, বিরাট মহীরুহ আশে-পাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে অতিকায় দৈত্যের মতো ম'রে পড়ে রয়েছে।

তার আগে 'দেবধাম' ছাড়তে হবে।

এই কথা, যদিও এমন স্পষ্ট ক'রে নয়, তবুও কেমন ক'রে যেন জেগেছে শঙ্করের মনে। তাকে অহরহ খোঁচার মতো বিঁধছে। তার মাথায় জ্বালিয়েছে আগুন :

দেবধাম ছাড়তে হবে। একটা অদৃশ্য শক্তির তাড়ায় তারই জন্যে যেন সে প্রস্তুত হচ্ছে।

কাশীনাথ সকাল থেকে কোথায় কোথায় ঘুরছিলো। জেলে এসেও বেশ আছে ওরা। খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিন্তাও নেই, ভাবনাও নেই। কিন্তু শঙ্কর পারে না। ওরা তাকে সঙ্গে আসবার জন্যে ডাকে। তবু পারে না। নিঃশব্দে জানালার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কী যে এলোমেলো ভাবে, তার সব সে নিজেও জানে না।

বিছানার উপর গায়ের পাঞ্জাবীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাশীনাথ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছেন বাবু? একটু পরে কোর্টে যেতে হবে মনে আছে তো?

—সে আজ বুঝি?

—বেশ! আজ ২৩শে না? জামা-টামা খুলে স্নান ক'রে নিন। দেরি করবেন না। এখনি খাবার আসবে।

—নিই। —পরম উদাসীনভাবে শঙ্কর উত্তর দিলে। তার যেন কোর্টে যাবার গা নেই।

বললে, একটা বিড়ি দাও তো কাশীনাথ।

—খাবেন?—কাশীনাথ খুশি হয়ে একটা বিড়ি বার করলে। বললে, জেলে বিড়ি যে কী অমূল্য বস্তু! এক পয়সায় একটি, তাও কত সাধ্যসাধনা করে!

সে আর একবার হাসলে।

কাশীনাথের তাড়ায় শঙ্কর তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে খেয়ে নিলে। তখনই ওয়ার্ডার এসে ওদের নিয়ে গেল। জেলের বাইরে 'ভ্যান' প্রস্তুত। ওরা একটি দল চলেছে তাইতে।

'ভ্যান' ছুটলো কোর্টের দিকে। সমস্ত রাস্তা পথচারী জনতাকে চকিত ক'রে ওরা থেকে থেকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করে। তারের জাল দিয়ে ঘেরা কালো বন্দী-গাড়ী। জনতার বুঝতে বিলম্ব হয় না ওরা কারা। তারাও প্রতিধ্বনি করে ওদের উৎসাহিত করে।

শঙ্করও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

কোর্টে প্রথমেই ওদের ডাক হ'ল। মিনিট কয়েকের ব্যাপার। কাশীনাথদের সবারই মামলার দিন ঘুরলো। শুধু শঙ্কর ছাড়া পেয়ে গেল।

শঙ্করের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এত লোক থাকতে হঠাৎ সে ছাড়া পেলে কেন?

তার বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। বরং অনুসন্ধানে পুলিশ জেনেছে সে নির্দোষ। এর বিরুদ্ধে তর্ক করার কিছু নেই।

শঙ্কর মুক্ত!

অনিশ্চিত পদে বাইরে এসে দেখে তাদের বড় গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে

আছে। স্থিরচিত্তে কোনো কিছুই ভাববার শক্তি তার নেই। কিছুই না ভেবে, কিছুই না বুঝে, চিরদিনের অভ্যাসমতো সে নিঃশব্দে মোটরে গিয়ে উঠলো।

[ ১৯ ]

ইউরোপে জার্মানী ও ইতালীর হার আরম্ভ হয়েছে। রাজা ইমানুয়েল আত্মসমর্পণ ক'রেছেন। জার্মানবাহিনী রোম অধিকার ক'রে মিত্রবাহিনীকে বাধা দিচ্ছে। ওদিকে সোভিয়েট বাহিনী স্মলেনস্ক ও কিয়েভ পুনরধিকার করেছে। লেনিনগ্রাড অবরোধমুক্ত। লাল ফৌজ ওদিকে পুরোনো রুশ-পোলিশ সীমান্ত এবং এস্তোনীয়া সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এদিকে বেসারেবিয়াও দখল করেছে।

কিন্তু মিত্রপক্ষের এই জয়-সংবাদেও ভারতবাসী ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। জার্মানী হারছে, এ কি ক'রে সম্ভব? নিশ্চয় কোথায় একটা কি প্যাঁচ আছে। মিত্রপক্ষ এগুচ্ছে এগুক, কিন্তু হঠাৎ একসময় শেষ প্যাঁচে প'ড়ে কাবু হয়ে যাবে হয়তো। যুদ্ধে কে যে কোথায় হারে কিছুই বলা যায় না। গেল মহাযুদ্ধে জার্মানী প্যারিসের কাছে এসে হেরে গিয়েছিল। এবারে মিত্রপক্ষ যদি বার্লিনের কাছে এসে হেরে যায়, তাতেই বা বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? বিশেষ যুদ্ধের খবর পরিবেশনের ভার যখন ইংরেজের হাতে, এবং আমরা নিজেরা যুদ্ধের কিছুই বুঝি না, তখন জয়-পরাজয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার উপায় কোথায়?

এমনি একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে খবর এলো জাপানীরা ভারতসীমান্ত অতিক্রম ক'রে মণিপুর রাজ্যে ঢুকে পরেছে।

খবর পাওয়া গেল ২২শে মার্চ। কিন্তু কবে যে তারা ঢুকেছে কে জানে। কে জানে বৃটিশ এবং মার্কিন সৈন্য ওদের ঠেকাতে পারবে কি না। যদি না পারে তাহ'লে ভারতবর্ষের কি অবস্থা হবে তা নিয়ে চায়ের দোকানে-দোকানে তুমুল গবেষণা চলতে লাগলো।

আশ্চর্য এই যে, যখন জাপানীরা সবে রেঙ্গুন দখল করলো তখন ক'লকাতা থেকে লোক পালাতে লাগলো। যখন প্রথম বোমা ফেললে—গোটা কতক মাত্র বোমা, কয়েকটিমাত্র দিনের জন্যে,—তখনও ক'লকাতা থেকে লোক-পালানোর সে কী ধূম! আর এখন, যখন খবর এলো খাশ জাপানী সৈন্য মণিপুরে প্রবেশ ক'রে গেছে, তখন ক'লকাতার ইন্দুরটি পর্যন্ত নড়বার লক্ষণ দেখালো না!

লোকেদের সাহস কি বেড়ে গেল? অথবা বার বার দু'বার ঠকে এবার আর তারা মৃত্যুর আগে ঠকতে রাজি হ'ল না?

অথচ কী কষ্টেই না লোকেরা কলকাতায় রয়েছে! মোটরের গ্যারাজ, পানের দোকান, এঁদো আস্তাবল সর্বত্র খোপে-খোপে মানুষ বাসা বেঁধেছে। খাবারের কষ্ট, পানীয় জলের কষ্ট, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া কিছুই গ্রাহ্য না ক'রে মানুষ সহস্র অসুবিধা এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রয়েছে, তবু জাপানীদের আগমন সংবাদেও কেউ ভয়ও পেলে না, নড়বার নামও করলে না।

নিত্য রকমের রকমের লোমহর্ষণ গুজব ওঠে। সকালে-সন্ধ্যায়, অফিসে চায়ের দোকানে-বৈঠকখানায় লোকে তা নিয়ে রসিয়ে গুলতানি করে। কিন্তু পালাবার কেউ নাম করে না। মিত্রপক্ষের আহত সৈন্যে হাসপাতাল ভর্তি হয়ে যাচ্ছে দেখেও কেউ ভয় পায় না। সবাই নিত্যনিয়মিত বাজার করে, অফিস যায়, রাত্রে বাড়ী ফিরে নিশ্চিন্তে

নিদ্রা যায়। লোকেদের প্রাত্যহিক জীবনে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন দেখা গেল না।

এই গোলমালে বজ্রমারুতি ফিরে এলো সদলবলে ক'লকাতায়। তারা গিয়েছিল আসাম সীমান্তে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের নাচ দেখিয়ে আনন্দ দেবার জন্যে,—অবশ্য সরকারী টাকায়।

কিন্তু এখন তাদের নাচ দেখবার সময় নেই। সুতরাং বজ্রমারুতিকে ফিরে আসতে হয়েছে।

কিন্তু নিঃশব্দে বসে থাকবার ছেলে বজ্রমারুতি নয়। সে ক্রমেই নিউ এম্পায়ারে একটা নাচ দেখাবার আয়োজন করলে। টিকিট-বিক্রির টাকা রেড ক্রসে দেওয়া হবে। সুতরাং টিকিট-বিক্রির ভাবনা নেই। দেশী-বিলাতী ছোট-বড় অফিসার থেকে কণ্ট্রাকটর, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর সবাই আসুন-না-আসুন মোটা মোটা টাকার টিকিট কিনে ফেলেছেন।

দু'খান টিকিট শ্রীমন্তও কিনেছে।

কিন্তু ওদের যাওয়া বুঝি হয় না।

টিকিট শ্রীমন্তকে কিনতেই হ'ত, কিনেছে। কিন্তু ললিত-কলার উপর বিন্দুমাত্রও তার অনুরাগ নেই। সে নাচ দেখতে যাবে না। সুমিত্রারও একা যেতে ইচ্ছা করে না।

অথচ বজ্রমারুতি তাকে বারবার আসবার জন্যে একদিন অনুরোধ ক'রে গেছে। তার সঙ্গে সুমিত্রার সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে। এবং দুজনেরই দুজনকে বেশ লেগেছে।

বজ্রমারুতি ওর নাম নয়। পৃথক একটা পৈতৃক নাম ওর আছে।

কিন্তু নাচ দেখিয়ে দেখিয়ে যত সে খ্যাতি পেয়েছে ততই ছদ্ম নামটাই বিস্তৃতি লাভ করতে করতে আসল নামে পরিণত হয়েছে।

ছিপছিপে লম্বা ছেলেটি। মাথায় বড়-বড় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। তীক্ষ্ণ নাসা। দেহ যষ্টিতে নারীসুলভ কমনীয়তা। কথায় বার্তায় হাসিতে একটা আশ্চর্য সরলতা। আসলে বজ্রমারুতি নামটা ওকে মোটেই মানায় না।

এই সরলতাই বোধ করি সুমিত্রাকে আকর্ষণ করেছে।

নিউ এম্পায়ারে খাওয়ার বাধা ঘটায় সুমিত্রা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছিল,—কিছুটা নাচের জন্যে, কিছুটা বজ্রমারুতির জন্যে।

সুমিত্রাকে মুখভার করতে দেখে শ্রীমন্ত মনে মনে যাবার জন্যে কেবল প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় হেনরি এলো।

ওকে দেখে সুমিত্রা উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

জিজ্ঞাসা করলে, যাবে?

হেনরি জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

—নাচ দেখতে? ওরিয়েন্টাল ডান্সিং। নিউ এম্পায়ারে।

—ক'টায়?

—ছ'টায়। যাবে?

—যাব। তোমাদের নাচ আমি দেখিনি কখনও। সুতরাং এত বড় সুযোগ ছাড়া যায় না। কিন্তু আমার কথা শুনেছ?

—না।

—ডেরা-ডণ্ডা গুটোতে হবে এবার। ফ্রণ্টে যাবার ডাক এসেছে।

—কোন্ ফ্রণ্টে?

—সে কি আমি জানি? যেখানে হোক কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলবে,—বর্মায়, চীনে, সুদূর প্রাচ্যে।

সুমিত্রা মুহূর্তের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হোল। তার শ্যামল মুখের উপর দিয়ে হালকা এক টুকরো ছায়া খেলে গেল। চেয়ে দেখে, শ্রীমন্তর সাপের মতো চকচকে দৃষ্টি ওর মুখের উপর নিবদ্ধ। পুরু পুরু সম্বদ্ধ ওষ্ঠ-প্রান্তে একটুখানি হাসি। সে ঈর্ষার অথবা বিদ্রূপের বিচার করবার সময় সুমিত্রার নেই।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি হেনরিকে জিজ্ঞাসা করলে, কবে যাবে ?

—কালকেই। সেইজন্যে তোমাদের দুজনকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করতে এলাম। ওখান থেকে সিনেমায় এবং সেখান থেকে ডান্সে যেতে পারি। মোট কথা, আজকের দিনটা আমি তোমাদের নিয়ে কাটাতে চাই। মন্টি, কি বলো ?

শ্রীমন্তর মনের ভিতর ঈর্ষার কীট কামড়াতে সুরু করেছে। দুপুর থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সুমিত্রাকে হেনরির হাতে একা ছেড়ে দিতে তার ইচ্ছা নেই। কিন্তু এই দুর্বলতা পাছে সুমিত্রার চোখে পড়ে, সেজন্যে সে সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হ'ল।

বললে, যেতে পারলে খুবই খুশি হতাম হেনরি। কিন্তু আজকে তো আমার একেবারেই সময় নেই—দুপুরে তো নয়ই, অন্য সময়েও নয়।

সুমিত্রা গম্ভীরভাবে বললে, ওঁর একেবারেই সময় নেই হেনরি। ডান্সের টিকিট কেনা হয়েছে, অথচ ওঁর জন্যে আমার শুদ্ধ যাওয়া বন্ধ হচ্ছিল।

ভাগ্যে তুমি এলে, তাই যাওয়ার আসা হোল।

দুঃখের সঙ্গে হেনরি বললে, কিছুতেই যেতে পারবে না মন্টি ?

জোরের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে শ্রীমন্ত বললে, না। আমাকে মাপ করো হেনরি। আমার মোটে সময় নেই।

সময় না থাকলে আর উপায় কি? হেনরি একটা নিশ্বাস ফেলে সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে তুমি যাচ্ছ তো?

—নিশ্চয়।—সুমিত্রা যেন একটু অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গেই বললে। শ্রীমন্তর দিকে চাইলেই না।

—বেশ। আমি তাহ'লে এখন চললাম। ঠিক সাড়ে বারোটায় আসব এখন। কি বলো?

—তাই এসো।

হেনরি চলে গেল। সুমিত্রা তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসতেই শ্রীমন্তর ঘাড়ে যেন অনেক কাজ চেপে গেল।

ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ক'টা বাজছে মিতা?

মিতা? সুমিত্রার মনে হ'ল অনেক কাল পরে মূল শ্রীমন্ত যেন তাকে এই পুরাতন নামে ডাকলে।

মুহূর্তের জন্যে সে থমকে গেল।

তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে, দশটা বেজে গেছে। তুমি কি এখনই বেরুবে? তাহ'লে স্নান ক'রে নাও। আমি তোমার খাবার যোগাড় করি।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

হেনরি ফিরে এলো ঠিক সাড়ে বারোটায়।

শ্রীমন্ত বেরিয়ে গেছে কাজে। সুমিত্রা তৈরি হয়েই ছিল। হেনরি আসামাত্র বেরিয়ে পড়লো। অনেক দিন পড়ে তারা শুধু দুজনে হোটেলে একটা নিরিবিলি কোণে খেতে বসলো। বিয়ে হওয়ার পর থেকে শ্রীমন্তকে না নিয়ে সুমিত্রা হেনরির সঙ্গে কোথাও বার হয়নি!

এই প্রথম,—এবং হেনরি চলে যাচ্ছে, যদি চলে যায়,—হয় তো এই শেষ। কে জানে, হেনরি আর ফিরবে কি না!

অনেক দিন পরে সুমিত্রা একটা সিগারেট ধরালে।

ওদের আলোচনা আরম্ভ হোল নাচ নিয়ে,—ভারতীয় নৃত্য। হেনরি খুব উৎসাহের সঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। সুমিত্রাও এ সম্বন্ধে যতটুকু জানতো, খুব উৎসাহের সঙ্গে বোঝাতে লাগলো। ইউরোপীয় নৃত্য সুমিত্রা দেখেছে। তার সঙ্গীত, তার ছন্দ, তার দেহভঙ্গির সঙ্গে ভারতীয় নৃত্যের কোথায় পার্থক্য যথাসম্ভব সে কথা সে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু দুজনেই বেশ বুঝতে পারছে, ওদের আলোচনায় যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝেই। দেহের রেখা, পায়ের তাল, হাতের লীলায়িত ভঙ্গি কল্পনার সামনে থেকে মাঝে মাঝে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক সময় সুমিত্রা প্রশ্ন করলে, তোমার কালকে যাওয়াই ঠিক তাহ'লে।

হেনরি সোজা হয়ে বসলো। একটু হাসলে। বললে, এখন পর্যন্ত অন্য রকম কিছু তো শুনিনি।

—কোথায় যাচ্ছ তাও জানো না?

—না। তবে মনে হয় বর্মা ফ্রণ্টে, যেখানে যুদ্ধ চলছে। কিন্তু ওসব আলোচনা আমাদের করা নিষেধ সুমি। সুতরাং ও আলোচনা থাক।

হেনরি আর একবার হাসলে।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, হাসছ যে? তোমার কি খুব আনন্দ হচ্ছে?

—হবে না ? দেশ ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে, সাত সমুদ্র পেরিয়ে এলাম যুদ্ধ করতে। কিন্তু কোথায় যুদ্ধ ? দেড় বছর ধ'রে এইখানে পড়ে রয়েছি। এ কি ভালো লাগে ?

—কিন্তু যুদ্ধের কত বিপদ সে তো জানো।

—জানি ব'লেই তো উল্লাস। এসেছি প্রাণ দিতে, প্রাণ না দিয়ে ফিরে যাওয়াটা কি বিশ্রী দেখাবে না ?

সুমিত্রা শিউরে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি তাহ'লে মরবার জন্য যাচ্ছ হেনরি ?

হেনরি একটু অনিশ্চিত ভাবে হাসলে। হাত দুটো ঘষলে। বললে, অতখানি বলা বোধ হয় ঠিক হবে না সুমি। মরবার জন্যেই কেউ যুদ্ধে যায় না। তাহ'লে তো সে আত্মহত্যারই নামান্তর হয়। তবু মরবার প্রচুর সম্ভাবনা তো উপেক্ষা করা যায় না। তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই যেতে হয়।

হেনরি একটু থামলে।

তারপর বললে, আমি আর ফিরে আসব না, তাই জেনেই আমাকে বিদায় দাও। এই কথা সানফ্রান্সিস্কোর একটি মেয়েকেও ব'লে এসেছিলাম, তোমাকেও বলছি।

হেনরি ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

সানফ্রান্সিস্কোর মেয়ের কথায় সুমিত্রা উচ্চকিত হয়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলে, কেমন দেখতে সে ? তার কোনো ফটোগ্রাফ তোমার কাছে নেই ?

—ছিল, এখন নেই। ফেলে দিয়েছি।

—কেন ?

—সে অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে। না, না, তার আমি

দোষ দিতে পারিনে সুমি। দু'বৎসর আমি দেশছাড়া। এর মধ্যে সন্তান সম্ভাবনা হ'লে বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি বলো?

সুমিত্রা হাসি ঢাকবার জন্যে মুখ ফেরালে। তা হেনরির দৃষ্টি এড়ালো না। তার নিজেরও ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

তারপর বললে, জিগ্যেস করছিলে দেখতে কেমন? কিন্তু নারীর রূপ কোথায় বলো তো? তার দেহে?

হেনরি হেসে ঘাড় নাড়তে লাগলো।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, তবে কোথায়?

—পুরুষের চোখে।

সুমিত্রা বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে।

হেনরি দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আমার কথা বিশ্বাস করো সুমি। তোমার এবং তার দিকে চেয়ে আমি অনেকবার একথা ভেবেছি। জেনেছি, নারীর রূপ তার দেহে নয়, পুরুষের চোখে। আমার চোখে তুমি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছ সুমি। সেই কথাটি বলবার জন্যেই এত আয়োজন।

চক্ষের পলকে সুমিত্রার সমস্ত মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো। পুরুষের স্তুতিতে এমন ক'রে আর কখনও সে আরক্ত হয়ে ওঠেনি। নববধূর এই লজ্জা তার স্বভাবের বাইরে।

তা ছাড়া তার ভাগ্যই এমনি যে, আদিম মানুষই তাকে আকর্ষণ করে বেশি। তাকে আকর্ষণ করে শ্রীমন্ত, যার হৃদয়ের কোনো বালাই নেই; তাকে আকর্ষণ করে হেনরি, যার কামনা অত্যন্ত স্থূল, অত্যন্ত মাংসল। হৃদয়ের আবেদন তার কাছে এসে পৌঁছুলো এই প্রথম।

বড় ভালো লাগলো সুমিত্রার। তার মন যেন দুলে উঠলো। হোটেলের সুসজ্জিত হল কেমন রহস্যময় বোধ হতে লাগলো। তার

নিজের চোখেও যেন রহস্য ঘনিয়ে এলো। এবং সেই রহস্যভরা চোখ দিয়ে সে নিঃশব্দে নির্ণিমেষে চেয়ে রইলো হেনরির দিকে।

[ ২০ ]

সে রাত্রে সুমিত্রা যখন বাড়ী ফিরলো তখন রাত দুটো।

চাকরটা দরজা খুলে দিয়ে ওকে আর হেনরিকে একত্র ফিরতে দেখে অবাক হয়ে গেল। পরদিন সকালে সমস্তক্ষণ সেই অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তাকে খোঁচা দিতে লাগলো। চাকরটার দিকে সে যেন চাইতে পারছে না।

নাঁচ শেষ হয়েছিল সাড়ে আটটায়। সেখান থেকে হোটেলে ডিনার খেয়ে রাত দুটো পর্যন্ত যে হেনরির সঙ্গে মোটরে কোথায় কোথায় ঘুরেছিল কিছুই তার মনে পড়ে না। আবিষ্টের মতো সে ঘুরেছিল। তার জ্ঞান ছিল না, বোধ ছিল না, ইচ্ছাশক্তি পর্যন্ত যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

শোবার ঘরে এসে দেখে, শ্রীমন্ত অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। তার নাক ডাকছে জোরে জোরে। মুখে মদের উগ্র গন্ধ। মদ পানের ফলে মুখ আরক্ত। আজকাল প্রত্যহ শ্রীমন্ত মদ খাচ্ছে।

সুমিত্রার আসা সে টেরই পেলে না।

তার গায়ের চাদরখানা সুমিত্রা ভালো ক'রে টেনে দিলে। বড় বড় চুলগুলো এলোমেলো ললাটের উপর পড়েছিল। সযত্নে সেগুলো সরিয়ে দিলে।

তার সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ সুমিত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলো নিভিয়ে নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কাপড় ছাড়বার কথা মনেই হোল না। সে সামর্থ্যও নেই। অপরিসীম ক্লান্তিতে তার মস্তিষ্ক, তার মন যেন পদ্মফুলের মতো বুঁজে আসছে।

সকালে উঠে দেখে শ্রীমন্ত তখনও ঘুমিয়ে। মুখ পাণ্ডুর, রাত্রের সে আরক্ত আভা আর নেই। চোখের কোলে কলঙ্ক-লেখা।

সুমিত্রা উঠে বাথরুমে চলে গেল। স্নান সেরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ব'সে বার বার নিজের মুখখানা আয়নায় দেখতে লাগলো।

তার মুখেও অমনি কলঙ্কচিহ্ন নেই তো ?

না। সুমিত্রা ভালো ক'রে চেয়ে-চেয়ে দেখলে শিশিরেধোয়া কচি ঘাসের মতো তার মুখশ্রী। কলঙ্কের চিহ্নমাত্রও নেই। একটা রাত্রির গাঢ় ঘুমে সমস্ত ধুয়ে-মুছে গেছে।

কী ঘুম সে ঘুমিয়েছে! ঘুম নয়, যেন মৃত্যু। মৃত্যুর অন্ধকার সমুদ্রে পার হয়ে সে যেন নবজীবনের তীরে পৌঁছেচে।

শ্রীমন্ত পাশ ফিরে শুলো।

সুমিত্রা সভয়ে ব'লে উঠলো : সর্বনাশ! আবার ঘুমুবে না কি! সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

শ্রীমন্ত একবার চোখ মেলে চাইলে। জবাফুলের মতো টকটকে লাল চোখ। একবার একটু হাসলে, কি মনে ক'রে কে জানে। আবার চোখ বন্ধ করলে।

সুমিত্রা বললে, ওঠো। চা হয়েছে।

শ্রীমন্ত বললে, উঠতে পারছি না মিতা। সমস্ত শরীরে বেদনা ; মাথা বোঝার মতো ভারী হয়েছে, তুলতে পারছি না।

আশ্চর্য ক্লান্ত ওর কণ্ঠস্বর! আশ্চর্য করুণ!

সুমিত্রা উদ্বিগ্নভাবে ওর খাটের কাছে উঠে আসতেই শ্রীমন্ত একখানা হাত ওর কোলের উপর ছড়িয়ে দিলে।

সেই হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে অনুযোগের সুরে সুমিত্রা বললে, কেন অত মদ খাও? আজ কাল তুমি প্রায়ই খাচ্ছ। এমন করলে শরীর থাকে? দেখতো, চোখের কোলে কালি পড়েছে, মুখ ফ্যাকাশে!

শ্রীমন্ত জবাব দিলে না। নিঃশব্দে পড়ে রইলো।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলে, কখন ফিরলে তুমি?

ওর কণ্ঠস্বরে সুমিত্রা একটু যেন উত্তাপের আভাষ পেলে। উত্তরটা সে একটু ঘুরিয়ে দিলে।

বললে, তখন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে।

—ঘড়ি দেখিনি, কিন্তু বোধ হচ্ছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে ছিলাম। তার পরে কখন ঘুমিয়ে গেছি।

হেনরির উল্লেখমাত্র শ্রীমন্ত করলে না।

সুমিত্রা বললে, হাঁ। তুমি তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছিলে। কিন্তু তোমার গা এত গরম কেন? জ্বর নয় তো?

ভয়ে ভয়ে শ্রীমন্ত বললে, তাই হবে বোধ হয় সুমি। গায়ে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা চারিদিকে যে রকম বসন্ত হচ্ছে····

কথাটা শ্রীমন্ত শেষ করতে পারলে না। শুধু করুণভাবে সুমিত্রার দিকে চাইলে।

সুমিত্রার বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠলো। বিচিত্র কিছুই নয়। ওদের ঝিয়ের কি রকম একটি বোনপো ক'দিন হোল এই বসন্তেই মারা গেছে। শহরে বসন্ত হচ্ছে খুবই।

ওর মুখ শুকিয়ে গেল।

রোগের মধ্যে এই বসন্তকেই ওর সব চেয়ে ভয় এবং ঘৃণা। আর কোনো রোগই মানুষকে এমন কদাকার বীভৎস ক'রে দেয় না। ওর মনে হয়, সেই বীভৎস মুখ নিয়ে বেঁচে ওঠার চেয়ে মৃত্যুও সহস্রগুণে শ্রেয়।

ওর ভয় হোল। কিন্তু মুখে সে-ভয় প্রকাশ করলে না।

বরং শ্রীমন্তকে একটা ধমক দিয়ে বললে, কী বাজে কথা বলছ! জ্বর না ছাই। থার্মোমিটারটা দিই দাঁড়াও।

থার্মোমিটারে জ্বর উঠলো দেড়।

এবারে ও সত্যই ভয় পেলো। দেড় জ্বর নিতান্ত কম নয়।

ম্লানমুখে বললে, একটু জ্বর হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে এক্ষুণি ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।

সামনের টিপয়ে চাকরটা চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে গেছে অনেকক্ষণ। পাত্রের গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু সেদিকে সুমিত্রার খেয়ালই নেই।

ডাক্তারকে ডাকবার জন্যে সে টেলিফোনের রিসিভারটা তুললে।

ডাক্তার এসে যে খুব অভয় দিয়ে গেলেন, তা নয়।

চোখ জবাফুলের মতো লাল, গায়ে-মাথায় যন্ত্রণাও আছে। এসব যে একমাত্র বসন্তেরই লক্ষণ তা বলা যায় না। ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'তে পারে, ম্যালেরিয়া হ'তে পারে, কত কি হ'তে পারে। আজকেই প্রথম জ্বরটা এসেছে, আরও দু'একদিন না গেলে কিছুই বলা যায় না। তবে সময়টা খারাপ। একটু সতর্ক থাকাই ভালো।

হঠাৎ ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা টিকে নিয়েছেন?

বিবর্ণমুখে সুমিত্রা বললে, টিকে নিইনি তো?

—উনিত নেন নি?

—না।

—নেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, একটা প্রেস্‌ক্রপশন আমি দিয়ে যাচ্ছি। এইটে তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন এবং কেমন থাকেন, কাল সকালেই আমাকে খবর দেবেন।

প্রেসক্রপশন লিখে টুপিটা হাতে নিয়ে ডাক্তারবাবু উঠলেন। তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে সেইখানেই সুমিত্রা অভিভূতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপরে ধীরে ধীরে শ্রীমন্তের বিছানায় এসে বসলো।

শ্রীমন্ত এতক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে নিঃশব্দে শুয়ে ছিল। সুমিত্রা এসে বসতেই ক্ষীণ স্বরে বললে:

—এখানে নয় সুমি। ওই চেয়ারটায় বোসো। রোগটা ছোঁয়াচে।

সুমিত্রা ওর দিকে চাইলে। ওর ছোট ছোট চোখ মৃত্যুর ভয়ে যেন আরও ছোট হয়ে গেছে। মৃত্যুকে যে শ্রীমন্তর এত ভয়, ওর পেশীকঠিন বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে সুমিত্রা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। যে চোখ হিংস্রতায় এবং লোভে সাপের চোখের মতো চিকমিকিয়ে ওঠে, সেই চোখে শিশুর অসহায় দৃষ্টি!

একটু হেসে সুমিত্রা বললে, আচ্ছা, হয়েছে, থাক।

সুমিত্রার নিজের ভয় ওর ভয় দেখে তখনই উড়ে গেল। সে যেন শক্ত হোল। কোমরে কাপড় জড়িয়ে চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলো।

বললে, এঃ! জলটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একটু গরম

জল আনতে বলে দিই। তুমি খাবে একটু চা? অল্প জ্বরে চা খেতে দোষ কি?

—দোষ না থাকে তো দাও।

ওর কাতর কণ্ঠস্বরে সুমিত্রা হেসে ফেললে। বললে, ওরে বাবা! এ যে আত্মসমর্পণ যোগ দেখছি!

শ্রীমন্তও হাসলে। বললে, হ্যাঁ। 'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। এ কি খারাপ?

—না। খুব ভালো। কেবল অসুখটা সারলে থাকবে না এই দুঃখ!

সুমিত্রা ওকে পেয়ালা চা দিলে। চাকরটাকে ঔষধটা আনতে পাঠালে। তার পরে নিজের চা নিয়ে ওর বিছানার পাশে এসে বসলো।

খাটের বাজুতে বালিশে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় শ্রীমন্ত চা খেতে লাগলো।

একটু পরে শ্রীমন্ত বললে, শরীরটা খুব খারাপ করছে। দুপুরের দিকে জ্বরটা সম্ভবতঃ বাড়বে। যদি বাড়ে, কি হবে সুমিত্রা?

—কী আবার হবে? জ্বর কি কারও বাড়ে না?

শ্রীমন্ত খপ ক'রে ওর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, তুমি তখন আমাকে ফেলে পালাবে না তো?

সুমিত্রার বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না:

—পালাবো? তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে? এসব কথা তোমার মনে জাগছে কি ক'রে?

—না, ধর, যদি ডাক্তারে যা ব'লে গেলেন তাই হয়?

—ডাক্তারে কী বলে গেলেন?

কথাটা বলতে শ্রীমন্তের মুখে যেন বাধছিলো। কোনো মতে কথাটা বললে, ধর, যদি মায়ের দয়াই হয়!

'মায়ের দয়া'! রোগটার নাম উচ্চারণ করতেও শ্রীমন্তর সাহস হচ্ছে না! এই দুর্বল মুহূর্তে বহু পুরুষের কুসংস্কার কি প্রবল হয়ে উঠলো?

সুমিত্রা বললে, অসুখে তুমি এমন ভেঙে পড়তে পারো এ আমি ধারণাই করতে পারিনি।

ব্যগ্রভাবে শ্রীমন্ত বললে, আমি অমনিই ভেঙে পড়ি মিতা। রোগে আমার ভয়ানক ভয়, মৃত্যুকে আরও বেশি। নিজের দিকে ছাড়া কারও দিকে কখনো চাইনি। ভয় হয়, আমার এই দুঃসময়েও সবাই বুঝি আমাকে ফেলে পালাবে।

শ্রীমন্ত করুণ নেত্রে ওর দিকে চাইলে। তার চোখের কোণ বয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

সুমিত্রা বললে, কিন্তু সবাই তোমার মতো স্বার্থপর তো নয়। দয়া-মায়া আছে এমন লোকই সংসারে বেশি। তাই সাধারণ লোকে অসহায় রোগীকে ফেলে পালায় না।

শ্রীমন্ত এ্কথার একটিও জবাব দিলে না। নিঃশব্দে শুনে গেল।

সুমিত্রা বললে, তাছাড়া আমি তোমার স্ত্রী। এই অসহায় অবস্থায় কোনো স্ত্রীই তার স্বামীকে ফেলে পালায় না। দেখছ কোনো স্ত্রীকে পালাতে?

—দেখেছি। আমাদের গ্রামের একটি বৌ....

—হ্যাঁ। একটি বৌ....এবং সেই একটি ঘটনাই মনে এঁকে রেখেছে। কিন্তু একশোটা বৌ কি করে তা দেখনি?

শ্রীমন্ত উত্তর দিলে না।

সুমিত্রা হাসলে।

বললে, সেই বৌটির সঙ্গেই তোমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমার মতো পাষণ্ডের উপরও ভগবানের কি করুণা দেখ। তোমাকে তিনি তার হাতে দেননি, দিলেন আমার হাতে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, অসুখ তোমার নাই হোক, সেবাযত্নের কোনো অভাব হবে না। দাঁড়াও তোমার মুখ ধোবার জল নিয়ে আসি।

ব'লে সস্নেহে ওর হাতের উপর একটা চাপ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বসন্ত নয়। সাধারণ জ্বরই, তবে ভোগাবে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। পাঁচ পর্যন্ত উঠছে, নিরানব্বুইএর নিচে আর নামছে না।

সম্পূর্ণভাবে জ্বর ছাড়লো পাঁচ দিনের দিন। কিন্তু বিকেলে আবার এল প্রচণ্ড জ্বর। রক্তটা আবার পরীক্ষা করানো দরকার। ডাক্তারের সন্দেহ হচ্ছে, ম্যালেরিয়া।

কিন্তু জ্বর যাই হোক, সেবা করলে বটে সুমিত্রা। কী সুশৃঙ্খল, কী পরিপাটি! ডাক্তারকে স্বীকার করতে হোল, এমন সেবা তিনি কখনো দেখেন নি।

ছ'দিনের সকালে জ্বরটা যখন ছাড়লো, তখন হেসে তিনি শ্রীমন্তকে বললেন, আপনার স্ত্রীভাগ্যে হিংসে হচ্ছে। দিনরাত্রি এরকম অক্লান্তভাবে এবং প্রাণঢেলে সেবা করতে কাউকে কখনো দেখিনি।

এই প্রশংসা সুমিত্রার বড় ভালো লাগলো। ছোট মেয়ের মতো লজ্জায় সে আরক্ত হয়ে উঠলো।

ডাক্তার চ'লে যেতে শ্রীমন্ত সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, এখন তো জ্বর নেই। এলেও বিকেলের মধ্যে আসবে না বোধ

করি। এই সময় তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও বরং। এ ক'দিন চোখের পাতা বোঁজনি।

—তুমি কি ক'রে জানলে?

মিটিমিটি হেসে শ্রীমন্ত বললে, আমি সব জানি। জ্বর যতই উঠুক, আমার জ্ঞান সহজে লোপ পায় না। পাষণ্ডদের সব গেলেও জ্ঞান শেষ পর্যন্ত টনটনে থাকে।

সুমিত্রার সেদিনের 'পাষণ্ড' অভিধার জবাব!

সুমিত্রা হেসে বললে, তা বুঝতে পারছি। শুধু জ্ঞান নয়, রাগও টনটনে থাকে।

—রাগ?—শ্রীমন্ত একটু হাসবার চেষ্টা করলে,—রাগ করব কেন সুমি, তুমি তো অন্যায় কিছু বলোনি। আমি যে পাষণ্ড সে কথা আমার চেয়ে নিঃসংশয়ে আর কে জানে? তার জন্যে রাগ করিনে,—নিজের উপরও না, যে ভগবান আমাকে এমনি ক'রে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপরও না। আমার রাগ করার মুখ নেই।

—খুব কথা শিখেছ! একটু পাশ ফিরে শোও তো, বিছানার চাদরটা বদলে দিই।

অত্যন্ত নিপুণ হাতে সুমিত্রা ওর বিছানার চাদরটা বদলে দিলে।

শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি নার্সিং শিখেছিলে সুমি?

—শিখিনি? নার্সিংএই তো এম-এ পাস করেছি!

—না, ঠাট্টা নয়। তুমি সেবা কর, মনে হয় যেন শিক্ষিত নার্স সেবা করছে।

এবারে সুমিত্রা যেন একটু রাগলো। অল্প ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, তুমি এই কথা বলছ, ডাক্তারবাবু এই কথা বলছেন। কিন্তু বুঝিয়ে দাও তো আমি বেশিটা কি করেছি?

চোখ বন্ধ করে শ্রীমন্ত বললে, বুঝিয়ে দিতে পারব না। এ বুঝিয়ে দেবার ব্যাপারও নয়। কারণ এর বেশি-কমের মাত্রা কিছু নেই। কিন্তু আমার অসুখে তুমি যা ক'রেছ, সে অদ্ভুত, অসাধারণ। একথা ডাক্তারবাবুও বলবেন, আমিও বলবো, যে দেখেছে সেই বলবে। কিন্তু তুমি একটু ঘুমুবে না মিতা? একটু ঘুমোও।

—ঘুমুবো। কিন্তু এখন নয়। তোমার ফলটা ছাড়িয়ে দিই। তারপরে দুপুরে ওই সোফাটায় শুয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নোব।

সুমিত্রা হাসলে।

শ্রীমন্ত বললে, সেই সময় তোমার সোফার এক পাশে একটুখানি আমাকে বসিয়ে দেবে? আজকে আমার শরীরটা তো ভালোই বোধ হচ্ছে।

বিস্মিত নেত্রে সুমিত্রা বললে, তখন সোফার এক পাশে বসবে? কেন বলো তো?

লজ্জিত কাতর কণ্ঠে শ্রীমন্ত বললে, তোমাকে একটুখানি ভালো বাসবার চেষ্টা করব সুমি। আমি নিঃশব্দে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো। তুমি জানতে পারবে না।

এবারে সুমিত্রা হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, রক্ষে কর। যা পারো না, তা করতে যেও না। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার চেষ্টা কর। এ ক'দিনের অসুখে তোমার চোরাবাজারে কত টাকার ক্ষতি হয়েছে হিসেব করেছ?

শ্রীমন্ত জবাব দিলে না। চোখ বন্ধ ক'রে নিঃশব্দে পড়ে রইলো। ফল ছাড়িয়ে একটা প্লেটে রাখতে রাখতে সুমিত্রা বললে, বিকেলে তোমার জরটা যদি না আসে, তাহ'লে ভাবছি একবার 'দেবধাম' থেকে ঘুরে আসব।

'দেবধামের' নামে শ্রীমন্ত চমকে চোখ মেলে চাইলে।

জিজ্ঞাসা করলে, 'দেবধাম' কেন?

ফল-কাটা থেকে মুখ না তুলেই সুমিত্রা বললে, ক'দিন থেকে কেবলই ছোটদির কথা মনে হচ্ছে। ভাবছি, তাকে একবার দেখে আসব।

—ক'দিন থেকে হৈমন্তীকে মনে পড়ছে কেন?

—কি জানি। একদিন অনেক রাত্রে খাটের বাজুতে মাথা রেখে তন্দ্রা গেছি, তার মধ্যেও তাকে স্বপ্ন দেখলাম।

শ্রীমন্ত কথা কইলে না। কি যেন ভাবতে লাগলো।

একটুক্ষণ পরে সুমিত্রা বললে, বেশিক্ষণ দেরি করব না সেখানে। যাব আর আসব। সেইটুকু সময় একলা থাকতে পারবে না?

—পারব।

শ্রীমন্ত পাশ ফিরে শুলো।

ব্যস্তভাবে সুমিত্রা বললে, ওকি, পাশ ফিরছ কি! ফলটুকু খেয়ে নাও।

শ্রীমন্ত সাড়া দিলে না।

সুমিত্রা ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে: শুনছ? পাশ ফেরো। ফলটা খেয়ে নাও।

—একটু পরে সুমিত্রা, পাঁচ মিনিট পরে।

শ্রীমন্ত আবার চোখ বন্ধ করলে।

[ ২১ ]

বিকেলের দিকে শ্রীমন্তর জ্বর আর এলো না।

বাইরের ঢাকা বারান্দায় একখানি ঈজিচেয়ারে ওকে সযত্নে বসিয়ে রেখে সুমিত্রা গেল 'দেবধাম'।

'দেবধাম' যেন অত্যন্ত দ্রুত অধঃপতনের পথে নেমে চলেছে। ক'দিনই বা আসেনি সে! এই ক'দিনেই অধঃপতনের গতি স্পষ্ট বোঝা যায়, বাড়ীর দিকে চাইলেই। দেওয়ালের চূণকাম খসছে, গাড়ী-বারান্দার সামনের জঞ্জাল বাড়ছে, দেওয়ালের ঘুলঘুলিতে খোপে-খোপে গোলা পায়রার সংখ্যাও অসম্ভব গতিতে বাড়ছে।

বাইরে দেউড়িতে একটা দারোয়ান টুলে বসে এখনও ঝিমুচ্ছে, কিন্তু ভিতরে চাকর-বাকরের একেবারেই কোলাহল নেই। দারোয়ানটার সঙ্গে এত বড় বাড়ীও যেন ঝিমুচ্ছে।

নিচেতলায় কারও সঙ্গে তার দেখা হোল না। সরাসরি উপরে উঠে হৈমন্তীর শোবার ঘরে দরজার কাছে এসেই সুমিত্রা থমকে দাঁড়ালো।

একখানি খাটে শীর্ণ স্বর্ণলতার মতো শুয়ে আছে হৈমন্তী। খাটের উপর তার বুকের একান্ত সন্নিকটে ব'সে সুবিমল তার হাত-দু'খানি ধ'রে কি যেন চুপি-চুপি বলছে।

দোরের দিকে পিছন ক'রে সে ব'সে ছিল। সুমিত্রার আসা টের পায়নি।

হৈমন্তী তাকে দেখে শীর্ণ হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলে। বললে, বোসো।

সুবিমল পিছন ফিরে সুমিত্রাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল। হৈমন্তী উঠতে দিলে না। চোখের ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, ওটা এইখানে টেনে নিয়ে এসো সুমিত্রাদি।

সুবিমলকে এর আগে সুমিত্রা কখনও দেখেনি।

হৈমন্তী হেসে বললে, কে বলো তো?

সুমিত্রা হেসে বললে, বুঝতে পেরেছি। সুবিমলবাবু।

সুবিমলের দিকে চেয়ে হৈমন্তী বললে, শ্রীমন্তদা'র স্ত্রী।

ওরা পরস্পরকে নমস্কার করলে।

সুমিত্রাই আগে কথা বললে। বললে, ভাগ্যিস আগে খবর দিয়ে আসিনি, তাই আপনার দেখা পেলাম।

—নইলে দেখা পেতেন না?—সুবিমলও হাসতে হাসতে জবাব দিলে।

—পাইনি তো। কতদিন এ বাড়ী এসেছি, আপনার দেখা একদিনও তো পাইনি।

—সে আমারই দুর্ভাগ্যের জন্যে। খবর দিয়ে আসার জন্যে নয়। আপনার কথা এত শুনেছি যে, আপনাকে দেখবার লোভ অনেক দিনের।

সুমিত্রা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, বলেন কি! এত কথা কার কাছে শুনলেন?

—জিজ্ঞেস করুন ওকে। ব'লে ইঙ্গিতে হৈমন্তীকে দেখালে।

হৈমন্তী হেসে বললে, সত্যি ভাই। তোমার কথা আমাদের মধ্যে প্রায়ই হয়।

সুমিত্রা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সঙ্গে আমার ক'বারই বা দেখা হয়েছে! এত কথা আমার সম্বন্ধে কী হয়?

হৈমন্তী বললে, তা জানিনে ভাই। কিন্তু মাঝে-মাঝেই তোমার কথা হয়।

সুবিমল বললে, কথা হবার জন্যে বেশি বার দেখার দরকার হয় না বৌদি। যাকে ভালো লাগে, তাকে এক মিনিটেই লাগে।

সুবিমলের বৌদি সম্বোধনে সুমিত্রার মুখ কি জানি কেন হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

বললে, আপনাদের সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই।

বলেই হৈমন্তীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছ ছোটদি ?

হৈমন্তী জবাব দেবার আগেই সুবিমল বললে, মাঝারি। আগের চেয়ে ভালো। কিন্তু একে ঠিক ভালো বলা এখনও যায় না।

কৃত্রিম কোপে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে সুমিত্রা বললে, ছোটদি'র শরীরের দিকে চেয়ে একথা বলতে আপনার লজ্জা করছে না ?

হাত জোড় ক'রে সুবিমল বললে, প্রথম-প্রথম করত বৌদি, এখন আর করে না। কিন্তু বেছে-বেছে এমন দিনে এসেছেন যেদিন আমার সময় কম। আবার কবে দেখা হবে বলুন।

সুমিত্রা হেসে বললে, সে ভার যদি আমার উপর দেন, তাহ'লে বলব জানিনে। আর যদি নিজের উপর নেন, তাহ'লে যে-কোনো দিনই দেখা হতে পারে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সুবিমল বললে, বেশ, নিজের উপরই নিলাম। এর মধ্যে যে-কোনোদিন গিয়ে উঠবো আপনার বাড়ী। উৎপাত ভাববেন না তো ?

—কী যে বলেন ! উৎপাত ভাববো আপনি গেলে ?

—বেশ। আজকে উঠলাম হিমু।

আচ্ছা।

সুবিমল চলে গেলে সুমিত্রা বললে, তোমার কাছে আজকে কিন্তু অকারণে আসিনি ছোটদি।

তবে ?

—একটু মন ভালো করতে এলাম।

হৈমন্তী হেসে বললে, আমার কাছে মন-ভালো-করার ওষুধ আছে ব'লে তো জানতাম না।

—তুমি জানতে না, কিন্তু আমি জানতাম।

—তাই নাকি? তাহ'লে মন ভালো করা আরম্ভ হয়ে যাক।

—আরম্ভ হয়ে গেছে।

—কখন থেকে? ওঁকে দেখার পর থেকেই নাকি?

সুমিত্রা ওর গাল টিপে দিয়ে বললে, না, তোমাকে দেখার পর থেকে। এ ক'দিন কি ক'রে যে কাটলো, সে তোমাকে বলবার নয়।

—কেন?

—ওঁর জর। মরতে এত ভয় আমি কখনও কারও দেখি নি ছোটদি। ভয় হোত, এই অবস্থায় ওঁকে ফেলে আমি পালোবো। ভাবতে পারো?

সুমিত্রা হাসতে লাগলো।

হৈমন্তী কিন্তু হাসলে না। তার শীর্ণ মুখমণ্ডলে কালি-পরা চোখ ছুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

জিজ্ঞাসা করলে, তারপরে?

—তারপরে আর কি? পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ঠায় ব'সে কেটেছে। এক একসময় মনে হ'ত, আর পারিনে, ছুটে গিয়ে তোমাকে ডেকে নিয়ে আসি। এলে তুমি যেতে?

—আমি? আমি কেন যাব?

সুমিত্রা রাগ করলে না। বললে, আমিও তাই ভেবেছিলাম তুমি কেন আসবে? তবু ওঁর এবং আমার অজস্র বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একা তোমাকে ডাকবার কথাই মনে হ'ত।

—এখন কেমন আছেন ?

—ভালো।

একটু পরে সুমিত্রা বললে, এদিকে তো এত শক্ত। কিন্তু জ্বরের সময় ও যে কত দুর্বল হয়ে যায়, দেখলে তোমার করুণা হ'ত। একটা শিশুর মনে যেটুকু জোর থাকে, ওর যেন তাও ছিল না। সে একটা দেখবার জিনিস ?

ওর বলার ভঙ্গিতে হৈমন্তী হেসে ফেললে।

তারপর বললে, এত লোক থাকতে আমার কথাই তোমাদের মনে হ'ত কেন ?

—সে কি তুমি জানো না ?

—না।

—তাহ'লে আর শুনে কাজ নেই।

—আছে কাজ। তুমি বলো।

সুমিত্রা দ্বিধা করতে লাগলো।

হৈমন্তী অধৈর্যের সঙ্গে বললে, বলো।

—নিতান্তই শুনবে ?

—হ্যাঁ।

—তাহ'লে শোনো।

সুমিত্রা বলতে লাগলো :

—ওঁর মনের মধ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা কিছুই নেই,—সে তুমিও জানো, আমিও জানি। একটা অত্যুগ্র স্বার্থের জ্বালা ওঁকে হাউইএর মতো নিরন্তর উপরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এর মধ্যে, কেমন ক'রে জানিনে, তুমিই ওঁর মনের মধ্যে একটুখানি দাগ কেটেছ।

বিস্ময়ের আতিশয্যে হৈমন্তী বিছানায় উঠে বসলো। বললে; আমি?

—তুমি, এবং একমাত্র তুমি। নিজের প্রয়োজন ছাড়া কোনো মানুষকেই কখনও ওঁর মনে পড়ে না। কেবল তোমার কথাই ভুলতে ওর কষ্ট হচ্ছে।

হৈমন্তী নিঃশব্দে চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লো। ওকে সামলে নেবার সময় দেবার জন্যে সুমিত্রাও চুপ ক'রে রইলো।

একটুক্ষণ পরে বললে, ওঁর অসুখের সময় শুধু ওঁর নয় আমারও একটু ভয় হয়েছিল। তখন মনে পড়লো তোমাকে। ভেবেছিলাম, বাড়াবাড়ি হ'লে যেমন ক'রেই হোক তোমাকে একবার টেনে আনতেই হবে। তোমাকে দেখলে, হয়তো একটু সান্ত্বনা পাবে, সাহসও পাবে। ভগবান রক্ষে ক'রেছেন, তার প্রয়োজন হয়নি।

—ভগবান করুন, তার প্রয়োজন যেন কখনও নাও হয়।—হৈমন্তী আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগল,—তোমাকে জানাচ্ছি, ওঁরও জেনে রাখা ভালো, ওই লোকটির সম্বন্ধে আমার মনে ঘৃণা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই নেই।

—এ কি কখনও সত্যি হতে পারে?

—পারে। কিন্তু এ নিয়ে আর কোনো কথা নয় সুমিত্রাদি। এ প্রসঙ্গ এইখানেই থাক। আর কোনো দিন এ প্রসঙ্গ আমার সামনে তুলোও না।

সুমিত্রা চুপ ক'রে গেল।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, শঙ্করকে দেখছি নে ছোটদি?

হৈমন্তী আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে, তাকে নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ সকলের আর একটা যন্ত্রণা হয়েছে। বাড়ীতে সে থাকে না বললেই হয়। দু'বেলা দুটো খাবার সময় আসে, তাও সবদিন নয়।

—কি ক'রে সে ?

—কে জানে! যেমন চোয়াড়ে চেহারা হচ্ছে, তেমনি চোয়াড়ে কথাবার্তা। আমার তো ওর সঙ্গে কথা কইতেই ঘেন্না হয়।

হৈমন্তী অসীম ঘৃণায় মুখ ফেরালে।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, এই বয়সেই ও কি একেবারে শাসনের বাইরে চলে গেছে ?

হৈমন্তী বললে, বাইরে ? কিন্তু শাসন করবে কে সুমিত্রাদি ? বাবা ?

রাগে দুঃখে হৈমন্তীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। বললে, তুমি একদিন বলেছিলে, এ বংশের নীলরক্ত শেষ হয়ে আসছে। বোধ হয় তোমার কথাই সত্যি সুমিত্রাদি। আমি তো কোনো দিকেই এ বাড়ীর কল্যাণ দেখি না। এসেছি ছেলে হতে, কিন্তু কি যে ভয় করছে সে তোমাকে বলবার নয়। এ বাড়ীর দেয়ালগুলো পর্যন্ত যেন বিষে নীল হয়ে গেছে। শুধু মায়ের জন্যে এখানে থাকা সুমিত্রাদি, নইলে একটা মুহূর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না।

হৈমন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সান্ত্বনার একটা কথাও সুমিত্রার মুখে যোগালো না। সে নিঃশব্দে পরম স্নেহভরে ওর মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগলো। বালিশে মুখ ঢেকে হৈমন্তী কাঁদে। সুমিত্রার মনে হয়, যেন একটা অস্ফুট আর্ত গুঞ্জন 'দেবধামের' মর্মের মাঝখান থেকে দেওয়াল ভেদ ক'রে আসছে। ওর কেমন যেন ভয় করে।

শঙ্করকে বাঁচানো গেছে।

কিন্তু 'দেবধাম' বুঝি বাঁচানো যায় না।

ওর উপরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে। শ্রীমন্ত সেই শনি। আজকাল সন্ধ্যার পরে প্রত্যহ সে লুকিয়ে হিমাংশুর ঘরে আসছে। তাঁকে বহু কষ্টে সংগৃহীত দুর্লভ মদ্য দিয়ে আপ্যায়িত করছে। অনেক রকম যুক্তি-তর্ক উত্থাপন ক'রে তাঁকে বাড়ী বিক্রির সুবিধার কথা বোঝাচ্ছে। রাত্রে মাঝে-মাঝে মদ্যের ক্রিয়ায় তিনি বাড়ী-বিক্রিতে রাজি হয়ে যান। শ্রীমন্তকে লোক দেখতে বলেন। কিন্তু সকালে সে উৎসাহ আর থাকে না।

তখন বলেন, দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি। সুবিমলকে একবার জিগ্যেস করা দরকার।

শ্রীমন্ত বলে, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখুন। কিন্তু দেরী করবেন না। তা'হলে এমন ভালো পার্টি হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

ওর চোখের দিকে হিমাংশুবাবু চাইতে পারেন না। ওর চোখে যেন অজগরের তীব্র দৃষ্টি। মুখ নিচু করে বলেন, না দেরি হবে না। আজ বিকেলে আসবার কথা আছে। এলে জিগ্যেস করব।

সুবিমল হয়তো আসে। কিন্তু হিমাংশুবাবু লজ্জায় বাড়ী বিক্রির কথা জামাইএর কাছে তুলতে পারেন না।

শ্রীমন্ত শঙ্করকেও জপাবার জন্যে চেষ্টা করে। কিন্তু তার পাত্তা পায় না। যখনই শ্রীমন্ত আসে, শোনে সে বেরিয়ে গেছে। আগে সে যেমন বাড়ীর বাইরে বেরুত না, এখন ঠিক তার উল্টো। বাড়ীর ভিতরেই সে থাকে না।

বাড়ীর লোকেদের সন্দেহ, সে আজকাল বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমন্তর সন্দেহ, অজ্ঞাতসারে সে তার ভবিতব্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অমোঘ যে বিধিলিপি, তারই দিকে অন্ধবেগে সে ছুটে চলেছে।

তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সুবিমলকেও হিমাংশুবাবু এড়িয়ে চলেছেন। এর মধ্যে শ্রীমন্তর বহু টাকার মদ হিমাংশুবাবুর জঠর সমুদ্রে হারিয়ে গেল। আরও কত যাবে কে জানে?

শ্রীমন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো। এবং আর কূলকিনারা না পেয়ে একদিন নয়নতারার শরণ নিলে।

দোতলায় চওড়া বারান্দায় একখানা কার্পেটের আসনের উপর ব'সে তিনি তখন মালাজপ করছিলেন। ইঙ্গিতে শ্রীমন্তকে বসতে বললেন।

শ্রীমন্ত দেখলে, এই ক'মাসের মধ্যে ওঁর বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেছে। গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। কপালে দুশ্চিন্তার অগণিত রেখা।

চোখের তারায় সে কৃষ্ণজ্যোতিঃ নেই।

জপ সেরে হরিনামের ঝোলা ললাটে, মাথায় ঠেকিয়ে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে নয়নতারা জিজ্ঞাসা করলেন, সব ভালো তো? বৌমা ভালো আছে?

—ভালো।

একটু পরে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, হৈমন্তী কেমন আছে মা?

—ভালো নেই বাবা। কেমন যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

চিন্তিতভাবে শ্রীমন্ত বললে, কেন যে এ রকম হচ্ছে! বড়বাবুর শরীরের দিকেও চাওয়া যায় না।

নয়নতারা উত্তর দিলেন না শুধু তাঁর বুকের ভিতর থেকে একটা ভারি দীর্ঘ নিশ্বাস বের হয়ে এল।

একটু এদিক-ওদিক ক'রে শ্রীমন্ত বাড়ী বিক্রির কথাটা পাড়লে। বললে, আমি পুনঃ পুনঃ বলছি এই বাড়ীটা বিক্রি ক'রে সমস্ত দেনা শোধ ক'রে দিন। এত বড় বাড়ীর কোনো দরকার নেই এই ক'টি লোকের জন্যে। এখন এর দামও হবে অনেক। তাই থেকে দেনা শোধ ক'রেও নিজেদের থাকবার মতো একটা বাড়ী খুব কেনা যাবে। জমিদারীটাও বাঁচবে। তার আয়ে রাজার হালে দুটো পুরুষ চলে যাবে।

নয়নতারা বাধা দিয়ে বললেন, সে পরের কথা পরে হবে বাবা। আপাততঃ ওঁকে বাঁচাবে কি ক'রে সেইটে ভাবো। ঋণে ওঁর ভিতরটা পর্যন্ত যেন কুরে-কুরে খাচ্ছে বাবা, ওঁর দিকে চাইছি আর আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

নয়নতারা আঁচলে চোখের জল মুছলেন।

শ্রীমন্ত বললে, সেইটেই তো ভাবনার কথা মা। সেইজন্যেই বাড়ী বিক্রির কথা এত ক'রে বলছি।

এমন সময় হৈমন্তী নিঃশব্দে এসে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

ওর দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত থমকে গেল। কী চেহারা হয়েছে হৈমন্তীর! সারা দেহে একটি ফোঁটা রক্তের চিহ্ন নেই। শরীর হয়েছে কাঠির মতো শীর্ণ।

—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?

হৈমন্তী উত্তর দিলে না। শুধু রক্তহীন বড় বড় চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

নয়নতারা বললেন, তুমি এ বাড়ীর বড় ছেলে বাবা। ওঁর উপর

ভরসা কোরো না। সুবিমলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যাতে ভালো হয় তাই করো।

শ্রীমন্ত বললে, সুবিমলবাবুর কথা উনিও বলেন। শুনি তিনি আসেনও প্রায়। কিন্তু লজ্জায় বোধ করি তাঁর সঙ্গে একথা তুলতে পারেন না। সেই হয়েছে মুস্কিল।

নয়নতারা বললেন, মুস্কিল বললে তো হবে না বাবা। যা করতে হবে, তা সময়ে করাই ভালো।

কিন্তু বাড়ীটা বিক্রি করা ছাড়া কি আর উপায় নেই?—এতক্ষণ পরে হৈমন্তী কথা বললে।

ওর কথার সুরে কি যেন একটা ছিল যে, শ্রীমন্ত পর্যন্ত চমকে ওর দিকে চাইলে। মনে পড়লো সুমিত্রার সেই কথা : ওই তো 'দেবধামের' আত্মা।

শ্রীমন্তর চোখে আবার সেই দুর্জয় ক্ষুধা লক লক ক'রে উঠলো। বললে, আমি তো কিছু দেখি না। সুবিমলবাবু যদি কিছু কিনারা করতে পারেন।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শ্রীমন্ত সেদিনকার মতো চলে এল।

এর পরে একটা রবিবারে হঠাৎ শঙ্কর এসে উপস্থিত। মাথার চুল রুক্ষ, বিশৃঙ্খল। পরণের দেশী ধূতির কোঁচার নিচেটা কাদায় মাখামাখি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবীর উপর একখানা মূল্যবান শাল। কিন্তু তারও খানিকটা কিসে লেগে ছিঁড়ে গেছে।

শ্রীমন্তর শিক্ষিত দৃষ্টিতে কিছুই এড়িয়ে গেল না। বললে, কি খবর শঙ্কর?

—আমাকে একটা চাকরী-বাকরী কোথাও ক'রে দাও না শ্রীমন্তদা।

শ্রীমন্তর চোখ কপালে উঠলো। এতখানির জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না।

বললে, তুমি চাকরী করবে কি! এই বয়সে!

শঙ্কর বিজ্ঞের মতো বললে, তা ছাড়া উপায় নেই শ্রীমন্তদা। সংসারের অবস্থা তো বুঝতেই পারছো। কাল জামাইবাবু এসেছিলেন। তিনি বলছেন, বাড়ীটা বিক্রি ক'রে দিতে। এই তো অবস্থা! বাবাকেও তো চেনো। তাঁর সঙ্গে আমার বনবে না। সুতরাং চাকরী যদি করতেই হয়, এখন থেকে করাই ভালো। না কি বলো?

শ্রীমন্ত মনোযোগের সঙ্গে ওর সমস্ত কথা শুনলে। তারপর সুমিত্রাকে ডেকে বললে, শঙ্কর এসেছে। কিছু খাবার-টাবার আনাও। একটু চায়ের জন্যেও বলো।

শঙ্করকে চা-খাবার খাইয়ে শ্রীমন্ত বললে, চলো।

—কোথায়?

—তোমাদের বাড়ী।

সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলে,—তুমিও যাবে না কি?

অনেকদিন সুমিত্রা হৈমন্তীকে দেখেনি। প্রথমদিনেই ওকে যেন সে ভালোবেসে ফেলেছে। ওকে দেখবার আগ্রহে সুমিত্রা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে, নিশ্চয় যাব।

চলো।

শঙ্কর একটু ইতস্তত করছিল। হগ মার্কেট থেকে হৈমন্তীর জন্যে কি কতকগুলি টুকিটাকি জিনিস কেনবার ছিল। কিন্তু শ্রীমন্ত তাকে ছাড়লে না। ওর একটা কথাও শ্রীমন্তর বিশ্বাস হচ্ছিল না। এক রকম জোর ক'রেই ওকে নিয়ে ট্যাক্সিতে তুললে।

ট্যাক্সি গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই শঙ্কর হঠাৎ ব্যস্তভাবে ড্রাইভারকে বললে, থামো, থামো।

ট্যাক্সি থেমে গেল।

শ্রীমন্ত বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কি হ'ল ?

শঙ্কর বললে, ছোটদির কতকগুলো সাবান আর স্নো। ওই সামনের দোকান থেকেই নিয়ে যাই বরং। নইলে ছোটদি অনর্থ করবে। ওই যাঃ! টাকাটা কোথায় ফেললাম!

এপকেট ওপকেট হাৎরে হতাশভাবে শঙ্কর বললে, তোমার কাছে দশটা টাকা হবে ? দাও তো, বাড়ী গিয়ে দিয়ে দোব।

শ্রীমন্ত নিঃশব্দে ওকে দশটা টাকা দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, আমরা কি অপেক্ষা করব ?

—করতে পারো। কিংবা চলে যাও। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে শ্রীমন্ত হেসে বললে, ও আর আসবে না।

সুমিত্রা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে ?

—তার মানে 'দেবধামের' নীলরক্তের ধারা নিঃশেষ হয়ে এসেছে। 'দেবধামের' শেষ বংশধর অধঃপাতের পথ খুঁজে পেয়েছে। ও এখন গড় গড় ক'রে নিচের দিক চলবে। কেউ ওকে রুখতে পারবে না। ওকে দেখে বুঝতে পারোনি ?

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'দেবধামে' পৌঁছানো মাত্রই ওরা হিমাংশুবাবুর চীৎকার শুনতে পেলে। এত কালের মধ্যে শ্রীমন্ত হিমাংশুবাবুকে কখনও চীৎকার দূরে থাক, জোরে কথা বলতেও শোনেনি। সেই হিমাংশুবাবুর চীৎকার এত দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। দুর্ভাবনায় শ্রীমন্তর বুকের ভিতরটা

টিপ টিপ ক'রে উঠলো : শেষ পর্যন্ত ওঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল !

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওরা দুজনে ভিতরে গেল।

দোতলায় উঠেই দেখে, হিমাংশুবাবু সমস্ত বাড়ী যেন মাথায় ক'রে তুলেছেন। আর এমন কদর্য ভাষায় কাকে যেন গালাগালি করছেন যে তা কানে শোনা যায় না। শ্রীমন্ত আর সুমিত্রাকে তিনি যেন দেখতেই পেলেন না।

শ্রীমন্ত ইসারায় সুমিত্রাকে অন্দরে যেতে ব'লে হিমাংশুবাবুর পায়ের গোড়ায় উবু হয়ে পড়লো।

হিমাংশুবাবু থমকে গেলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল :

—শ্রীমন্ত ? ভিতরে এসো।

ঘরের ভিতরটা মদের বোতলে, ডিকাণ্টারে, এঁটো প্লেটে, মাংসের হাড়ে ও ঝোলে এমন নোংরা হয়ে আছে যে পা বাড়াতে ঘৃণা হয়।

শ্রীমন্তের একটা হাত ধ'রে হিমাংশুবাবু সেই ঘরের মধ্যে তাকে নিয়ে এলেন। হাত দিয়ে এঁটো প্লেটগুলো একটু সরিয়ে জায়গা ক'রে বললেন, বোসো। খাবে একটু ?

তারপরে শ্রীমন্তের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ঢক ঢক ক'রে খানিকটা নির্জলা মদ নিজের গলায় ঢেলে দিলেন।

বললেন, শুনেছ সব ?

শ্রীমন্ত ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে।

হিমাংশুবাবু বললেন, কালকে হিমু শঙ্করকে দশটা টাকা দিয়েছিল কি সব জিনিস কিনতে। সেই যে সে বেরিয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত ফিরলো না। এদিকে আমি একটা পাওনাদারকে দেবার জন্যে পাঁচ

শো টাকা লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছিলাম। আজ পাওনাদারের লোক আসতে সেই টাকাটা দেবার জন্যে সিন্দুক খুলে দেখি, সব ফক্কা। একটি তামা কোথাও নেই। বুঝলে, একটি তামা নেই।

বড়বাবু হাঃ হাঃ ক'রে অট্টহাস্য করলেন। আবার খানিকটা নির্জলা মদ গলায় ঢেলে বিকৃত কণ্ঠে বলতে লাগলেন :

—এই আমার পুত্র! এরই জন্যে বাড়ী রাখব, জমিদারী রাখব, কত আশাই না ক'রেছিলাম! শোনো শ্রীমন্ত, বাড়ী কেনবার জন্যে যে লোকটিকে তুমি স্থির করেছিলে, সে এখনও বাড়ী কিনতে রাজি?

—বোধ হয় রাজি।

—তাহ'লে তুমি সব ঠিক কর। কাল সোমবারে সব চুকিয়ে ফেলতে চাই। মনে কোরো না, আমি মাতাল হয়ে বলছি। আমি স্থির করেছি, বাড়ী-জমিদারী সমস্ত বিক্রি করব। ক'রে দেনাপত্র যা আছে পাই-পয়সা মিটিয়ে, যা থাকবে নিয়ে তোমার মা আর আমি বাকি জীবনটা কাশীবাস করব। তোমার মায়েরও তাই মত। তুমি কালকের মধ্যেই সব ঠিক ক'রে ফেল। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল শ্রীমন্ত, জীবনে ঘেন্না ধ'রে গেল!

হিমাংশুবাবু মুখটা বিকৃত করলেন।

শ্রীমন্তর চোখ আবার চকচক ক'রে উঠলো। লিকলিকে জিভের ডগা দিয়ে পুরু পুরু ঠোঁট একবার চেটে নিলে।

বললে, তাহ'লে দলিল-পত্র আজকেই তৈরী ক'রে ফেলতে হয়। আপনার শরীর কেমন আছে? এখন উঠতে পারবেন?

—খুব পারব। কী যে বলো তুমি।

হিমাংশুবাবু টলতে টলতে উঠে বললেন, চলো, কোথায় নিয়ে যাবে।

শ্রীমন্তও উঠে দাঁড়ালো। একবার দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলে, পারবেন তো যেতে? না হয় আজ থাক।

—না, না। থাকবে না। আজই সব শেষ করে ফেলতে চাই। কালকের জন্যে যেন কিছু না থাকে। দাঁড়াও, বোতলে আর একটু প'ড়ে আছে মনে হচ্ছে।

সেইটুকু নিঃশেষ করবার জন্যে হিমাংশুবাবু আবার বসলেন।

শ্রীমন্ত বাইরে এলো রঘুয়াকে একখানা ট্যাক্সি ডাকতে বলবার জন্যে। সুমিত্রা ব্যস্তভাবে এসে ওর হাত চেপে ধরলে।

—কি?

সুমিত্রা ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, ছোটদি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—কখন?

—ঘণ্টা দুই হ'ল। জ্ঞান তো হচ্ছে না!

শ্রীমন্ত একবার দ্বিধা করলে। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সামলে নিলে। 'দেবধাম' তার চাই। এত বড় সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে।

এক মুঠো নোট সুমিত্রার হাতে গুঁজে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, ডাক্তারকে খবর দাও। ওর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এ-বাড়ীতেই থেকো। আমি একবার বেরুচ্ছি। ফিরতে রাত হতেও পারে। যাও।

সুমিত্রা চ'লে গেল।

শ্রীমন্ত বাড়ীর দলিলপত্র নিয়ে হিমাংশুবাবুকে সঙ্গে ক'রে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে গেল এটর্ণী বাড়ী। ভালো এটর্ণী তার জানা আছে। তাঁর সঙ্গে এই বাড়ী কেনা সম্বন্ধে মোটামুটি কথা হয়েও রয়েছে।

বায়নাপত্র সম্পাদন ক'রে হিমাংশুবাবুকে নিয়ে শ্রীমন্ত যখন ফিরলো তখন রাত্রি এগারোটার কাছাকাছি।

'দেবধামে' নিঃঝুম।

ট্যাক্সি থেকে নেমে শ্রীমন্ত থমকে দাঁড়ালো: 'দেবধাম' কি মরে গেল?

এদিকটা অন্ধকার, ওদিকের দেওয়ালে শীতের পাণ্ডুর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সে তো আলো নয়, যেন 'দেবধামের' মৃতদেহের উপর শাদা চাদর বিছানো রয়েছে।

এই 'দেবধাম',—বলতে গেলে এই শ্রীমন্তের জননী, তার ধাত্রী। সাড়া দিচ্ছে না কেন? এর সমস্ত আলো কেন এমন ক'রে নিবোনো? কী তবে কিন'ল সে? সে কি কতকগুলো ইট-কাঠ-পাথর? এর আত্মার আলো কই?

শ্রীমন্ত ভিতরে-ভিতরে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তার পা টলছে। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী টলছে হিমাংশুবাবুর পা। ভদ্রলোক বোধ করি তাঁর জীবনের শেষ মদ্যপান আজ সেরে নিলেন।

তাঁকে নিয়ে শ্রীমন্ত খুব মুস্কিল বোধ করলে।

রঘুয়াকে ডাকা যায়, কিন্তু শ্রীমন্তের কণ্ঠ যেন বসে গেছে। এ-বাড়ীতে যেন চীৎকার করা চলে না।

অন্য সময় বাবুর ফেরার সাড়া পেলে রঘুয়া নিজেই ছুটে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আজকে সে যেন যাদুমন্ত্রে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে আসছে না।

শ্রীমন্ত নিজেই টলছে। তবু এক মাতাল আর এক বৃদ্ধ মাতালকে

ধ'রে ধ'রে নিয়ে চললো। বারান্দা, বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘর, তার পরে দোতালায় ওঠবার একটা সিঁড়ি, সেখানে থেকে আবার বারান্দা ঘুরে-ঘুরে তবে সেই ছোট ঘর, যেখানে বড়বাবু মদ্যপান করেন।

এই পথটা আসতে, শ্রীমন্তের মনে হ'ল, যেন অনন্তকাল লাগলো। পথেরও শেষ নেই, সময়েরও না।

কী ভয়ঙ্কর আজকের রাত্রি!

মরা ছাগলের চোখের মতো নিষ্প্রভ ওই মহাকাশ, অনন্তকালের সূক্ষ্ম সুতোয় ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের মালা গেঁথে গলায় পরেছে। পায়ের তলায় মৃত অজগরের মতো প'ড়ে রয়েছে নির্জীব মহাপথ, যেখানে পা বাড়াতেও ঘেন্না করে!

কী হ'ল এই পৃথিবীর? এর কি অন্তিম ঘনিয়ে আসছে?

ঘরের মধ্যে তখনও মদের বোতল, ডিকাণ্টার এবং এঁটো প্লেট ছাড়ানো। ফরাসের উপর বসবার জায়গা নেই। ওরা ঘর থেকে গেছে অনেকক্ষণ। এর মধ্যে রঘুয়া এসে যে ঘর পরিষ্কার ক'রে যায়নি কেন কে জানে!

নেশার ঘোরে আলো জ্বালবার কথা শ্রীমন্তের মনেই পড়লো না। সে একটা কোণে হিমাংশুবাবুকে দাঁড় করিয়ে সেই স্বল্পালোকে নিজেই ঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। তারও সর্ব শরীর নেশায় টলছে। চোখে যেন ভালো দেখতে পাচ্ছে না। অনেক কষ্টে বোতল-ডিকাণ্টার-প্লেটগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখলে। হাত দিয়ে জাজিমখানা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করলে। এবং সেইখানে হিমাংশুবাবুকে শুইয়ে দিলে।

মদের প্রভাবে হিমাংশুবাবু যেন তুরীয় লোকে পৌঁছে গেছেন। তাঁর সাড়াও নেই, শব্দও নেই। মাঝে-মাঝে শ্রীমন্তর দিকে জবাফুলের মতো লাল চোখে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চাইছেন, আবার চোখ নামিয়ে

নিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে কি যেন তাঁর বলবার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু বলতে পারছেন না। গলার কাছটা একবার থরথর ক'রে ন'ড়ে উঠছে, তারপর চোখ দিয়ে ঝর ঝর জল ঝরছে।

শ্রীমন্ত ওঁকে শুইয়ে দিতেই একবার ছটফট ক'রে হিমাংশুবাবু চোখ বন্ধ ক'রে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর নাক ডাকতে আরম্ভ করলো।

এইবারে শ্রীমন্ত যেন ঝাড়া-হাত-পা হ'ল। তার যেন একটা বোঝা নেমে গেল। হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে সে নিশ্চিন্তভাবে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে।

এইবার তাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে। এবং আরও যেন কি একটা ব্যাপার আছে তার ঠিক মনে পড়ছে না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দুই হাতে বুক চেপে ধ'রে সে ব্যাপারটা স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

এমন সময় জুতোর শব্দ ক'রে কতকগুলো লোক তার ঘরের পাশ দিয়ে নিচে নেমে চলে গেল।

কে ওরা ?

শ্রীমন্ত কান পেতে শুনলে ওদের পায়ের শব্দ নিচে মিলিয়ে গেল। মোটরের স্টার্ট দেয়ার শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মোটরখানা একটা শব্দ ক'রে বাইরে চলে গেল।

ওর সবই কেমন যেন অদ্ভুত বোধ হচ্ছে। এ কি ভৌতিক বাড়ীতে সে এসে পড়লো !···

ওই আবার যেন কারা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে না ? শ্রীমন্তর ভারি কৌতূহল হচ্ছে, বাইরে গিয়ে দেখে আসে ওরা কারা। কিন্তু সে সামর্থ্য নেই। ওর দুটো পা-ই কে যেন মেঝের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্বলে উঠলো।

শ্রীমন্ত নিঃশব্দে চেয়ে দেখলে, রঘুয়া। উপরে আসতে-আসতে রঘুয়ার কি মনে হয়েছে, আলোটা জ্বেলে একবার দেখলে।

—কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা? কখন এলেন?

উত্তরে জড়িত কণ্ঠে শ্রীমন্ত কি বললে, বোঝা গেল না।

রঘুয়া ছুটতে ছুটতে গিয়ে কোথা থেকে একটা বিছানা নিয়ে এলো। নিপুণ ক্ষিপ্রহস্তে সেটা এক পাশে পেতে বড়বাবুকে সেইখানে ভালো ক'রে শুইয়ে দিলে।

অঘোরে ঘুমাচ্ছেন ভদ্রলোক। এত কাণ্ডেও তাঁর ঘুম ভাঙলো না।

রঘুয়া শ্রীমন্তের দিকে চেয়ে বললে, ছোটদিদিমণির অসুখ খুব কঠিন দাদাবাবু। ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিলেন, কত কি করলেন, কিন্তু এখনও জ্ঞান হ'ল না। সেই অবস্থায় পেট চিরে ছেলে প্রসব করানো হ'ল—মরা ছেলে। কি হবে বাবু, বাঁচবেন তো?

রঘুয়া হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

বললে, এমন মেয়ে আর হয় না। যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। যেদিন থেকে এ-বাড়ী ছাড়লেন সেইদিন থেকেই এ-বাড়ীর মালক্ষ্মীও যেন ছেড়ে গেলেন। এমন গুণের মেয়ে আর হয় না। কখনও কাউকে একটা কড়া কথা বলেনি। চাকর-বাকরের উপর দয়া কত?

কাপড়ের খুঁটে রঘুয়া চোখ মুছলো।

বললে, যাবেন উপরে বাবু?

শ্রীমন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, না।

—চলুন না বাবু। সবাই রয়েছেন। বাগবাজার থেকে জামাইবাবু, বড়দিমণি, তাঁর শাশুড়ী সবাই এসেছেন। বৌদিও রয়েছেন। আহা! ছোটদিমণিকে একবার যে দেখেছে সেই ভালোবেসেছে। বৌদির সঙ্গে

ক'দিনেরই বা পরিচয়। কিন্তু বিকেল বেলায় সেই যে তাঁর কাছে ব'সেছেন, কেউ নড়াতে পাড়লে না!

বৌদিদি!

সুমিত্রা যে যে এ-বাড়ী এসেছে সেইটেই শ্রীমন্ত এতক্ষণ স্মরণ করতে পারছিল না।

বললে, আমি যাব না রঘুয়া। দেখছ তো আমার অবস্থা! এই অবস্থায় কোথাও যাওয়া যায় না। তোমার বৌদিদিকে তুমি এইখানে একবার ডেকে দেবে? তাড়াতাড়ি!

—যাই।

ব'লে রঘুয়া দ্রুতপদে চলে গেল।

শ্রীমন্ত আর দাঁড়াতে পারছে না। সাবধানে সেইখানে সে ব'সে পড়লো। পকেটের ফ্লাস্কে এখনও একটু মদ বোধ করি আছে। বাঁদিকের পকেট থেকে ফ্লাস্কটা সে বের করলে।

সুমিত্রা ঝড়ের মতো ছুটতে ছুটতে এল:

এইখানে ব'সে রয়েছ তুমি? আর উপরে কী কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে খবর রাখো না? ছোটদি যে যায়!

নির্বিকারভাবে শ্রীমন্ত বললে, তা আমি কি করব? তার সময় ফুরিয়েছে, সে যাচ্ছে। আমাদের যখন সময় ফুরোবে, আমরাও যাব।

ওর নির্বিকার কথা শুনে সুমিত্রার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। বললে, এই কথা তুমি বলছ? ছোটদির সম্বন্ধে?

—এই কথা সবাই বলবে সুমিত্রা। কেউ দু'দিন আগে যায়, কেউ দু'দিন পরে। ঠিক কি না বলো?

এতক্ষণে সুমিত্রার দৃষ্টি পড়লো অর্ধশূন্য ফ্লাস্কটার দিকে। বিস্ময়ে

ক্রোধে, ঘৃণায়, তার বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। কাঠের মতো শক্ত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীমন্ত নিশ্চিন্তভাবে টেনে টেনে বলতে লাগলো : দুঃখ করবার কিছু নেই সুমিত্রা। ভাগ্য যার ভালো সেই আগে যেতে পারে। হৈমন্তী চললো, আর ওই দেখ হৈমন্তীর বুড়ো বাবা মদ খেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন! উনি যেতে পারলেন না। এই দুনিয়া! এতে দুঃখ করবার কিছু নেই।

ফ্লাস্কের সেই তীব্র সুরা বিনা জলে শ্রীমন্ত গড়গড় ক'রে গলায় ঢেলে দিলে।

সুমিত্রা চীৎকার ক'রে উঠলো : অমনি ক'রে মদ খাচ্ছ তুমি?

বিষাক্ত সরীসৃপের মতো ছোট ছোট লাল চোখ মেলে শ্রীমন্ত সুমিত্রার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চাইলে। বললে :

—হ্যাঁ। এমনি করেই মদ খাব সুমিত্রা। আগুনের মতো তীব্র নির্জলা মদ। খাব না? তুমি বলো কি সুমিত্রা! যে দেশে দেনার জ্বালায় 'দেবধাম' বিক্রি হয়ে যায়, আর শ্রীমন্ত মিত্তির ব্ল্যাক-মার্কেটে লাখ-লাখ টাকা করে ; আর সোণার মেয়ে হৈমন্তী মরে অকালে, সেদেশে মানুষ মদ খাবে না তো খাবে কি?

একটু থেকে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে শ্রীমন্ত আবার বললে, তুমি ঠিক কথা বলেছ সুমিত্রা। হৈমন্তী এই 'দেবধামের' আত্মা। সে যাচ্ছে চলে। তার বুড়ো বাপ মাতাল হয়ে ওই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আর আমি এই মরা বাড়ী তিন লাখ টাকা দিয়ে কিনলাম! এর পরেও মদ খাব না? কিন্তু আর নয়, এইবার বাড়ী চলো।

ব'লে এঁটো প্লেট আর হাড়ের টুকরো আর খালি ডিকাণ্টারের পাশে সেই ঝোলের দাগ ধরা জাজিমের উপর শ্রীমন্ত নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে পড়লো।